KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5·5"x8·5"
Vol. & Number : 18/4 20/1 20/2 20/4 21/1	Year of Publication : Aug 1954 Sep 1955 Dec 1955 June 1956 Sep 1956
	Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু

পৌষ ১৩৬২
এক টাকা

কবিতা

উনবিংশ বর্ষের
সম্পূর্ণ সেট
এখনো
পাওয়া যাচ্ছে।

কবিতা,

অনুবাদ-কবিতা
ও
প্রবন্ধের
মূল্যবান সঞ্চয়ন।

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা
এই সেটের
অন্তর্গত।

চার টাকা
ভি. পি. ৪৮৵০

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র, ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে সাড়ে-পাঁচ টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ। কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে প্রকাশিত ও ৮।১ লালবাজার স্ট্রীট, স্বপ্না প্রেসে মুদ্রিত।

কবিতা

পৌষ ১৩৬২
বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮৪

সনেটগুচ্ছ

বুদ্ধদেব বসু

না-লেখা কবিতার প্রতি

(১)

অনন্য জন্মের দ্বার ; মরণের, অন্ত নেই কত :
বীজাণু, সরল ক্ষুর, হাঁটুজল, এক ফোঁটা বিষ।
এবং প্রভাবে তার নেই কোনো বিশ কি উনিশ,
শেলিও তেমনি মরে, শুকনো বুড়ি জরায়ণে যত।

এমনকি জন্মের আগেই তার আরম্ভ ; কেননা—
একটি আমের মূল্য শত লক্ষ মুকুলসংহার ;
যদিও একত্রে ছোটে জীবনের কোটি সম্ভাবনা,
পথে সব ম'রে গিয়ে, খুঁজে পায় জরায়ুর দ্বার

শুধু এক—শ্রেষ্ঠ নয়, বলীয়ান, আগ্রহে স্বাধীন ;
হয়তো সে নিরীহ বেচারামাত্র, তবু জ্যান্ত ব'লে,
অজাত বিক্রমাদিত্যে সকলেই অনায়াসে ভোলে।

—তোমরা, এখনো যারা সীমান্তেই রয়েছো বিলীন,
আমারে দিয়ো না দোষ ; নিত্য আমি আছি অনর্গল ;
কিন্তু বারে-বারে দেখি তোমাদেরই বিভিৎসা দুর্বল।

(২)

তোমরা, আমাকে যারা বেছে নিলে—তারপর অনেক ঋতুর
নাগর-দোলায় মেতে ভুলে আছো এ-দিন ক্ষণিক ;
মাঝে-মাঝে চিঠি লেখো, পুনশ্চের নিশ্বাসে বিধুর,
অথচ আংটি যদি দিতে চাই, নানা ছলে ফেরাও তারিখ,

কিংবা শুধু চুমো খেয়ে চ'লে যাও, কিংবা বাতাসেরে
চুমো খেয়ে, প্রপঞ্চে দুলিয়ে দাও উৎসুক আঙুর ;
কখনো, মদির চোখে, গোধূলির মতো হৃদয়েরে

ক'রে তোলো সুখ, স্বপ্ন, অভিলাষ, ব্যর্থতায় অনুবন্ধময়—
সান্তর, পুনরাবৃত্ত, অবিস্মর, পরিবর্তমান :—
তোমাদের বলি আমি : যদিও দুর্ভর অভিযান
হেনেছি অনেক বার, তবু জেনো, জনরব সব সত্য নয়,

সব নয় আক্রমণ, ক্রন্দন, বৃন্দাবনে মান-অভিমান।
কেউ-কেউ, বিরাট বিস্মিত ঋণে অকস্মাৎ ব্যাপ্ত ক'রে ক্ষমা
তৎক্ষণাৎ সর্বস্ব নিয়েছে। হয়তো বা তারাই পরমা।

(৩)

পরমা ?...জানে না কেউ। অন্তরঙ্গ তোমরা কি নও,
হৃদয়ের যুগ থেকে যুগান্তরে প্রত্যহের সমান্তরাল,
তুফান, হাঙর-ঢেউয়ে বেড়ে-ওঠা উজ্জ্বল প্রবাল,
প্রাকৃতিক অন্ধকারে বৎসরের অদ্ভুত বিনয়

গোপনে রাঙিয়ে দেয় যাদের তরুণতর উষার উদ্ভাস ?—
বুঝি না, হয়তো ভুলি। কিন্তু স্বপ্নমেঘময় ঘুমে
তোমরা নক্ষত্র ফোটো ; চমকে দাও হঠাৎ বাথরুমে ;

কখনো মাছের ঝোলে মিশে থাকো, সঙ্গে ঝোলো ট্র্যামের হাতলে।
তা-ই যদি, তবে কেন দেরি করো ? বালিকার মতো কৌতূহলে
এখনো দেখতে চাও কত দূর প্রস্তুত প্রয়াস ?

এসো না, আঘাত করো, ধ'রে নাও আমারে উদাস,
হানো এক মুহূর্তে বাঁধন-ছেঁড়া বিদ্যুতের মতো বলাৎকার ;
না যদি স্বর্গের মধু, উর্বশীর ধীর অভিসার,
নিয়ে এসো গন্ধকে লবণে জ্বলা নরকের প্রকট নিশ্বাস।

স্টিল্ লাইফ

সোনালি আপেল, তুমি কেন আছো ? চুমো-খাওয়া হাসির কৌটোয়
দাঁতের আভায় জ্বলা লাল ঠোঁটে বাতাস রাঙারে ?
ঠাণ্ডা, আঁটো, কঠিন কোনারকের বৈকুণ্ঠ জাগাবে
অপ্সরীর স্তনে ভরা অন্ধকার হাতের মুঠোয় ?

এত, তবু তোমার আরম্ভ মাত্র। হেমন্তের যেন অন্ত নেই।
গন্ধ, রস, স্নিগ্ধতা জড়িয়ে থাকে এমনকি উন্মুখ নিচোলে।
তৃপ্তির পরেও দেখি আরো বাকি ; এবং ফুরোলে
থামে না পুলক, পুষ্টি, উপকার। কিন্তু শুধু এই ?

তা-ই ভেবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝে-মাঝে
আসে ভারি-চোখের দু-একজন কামাতুর, যারা
থালা, ডালা, কাননের ছদ্মবেশ সব ভাঁজে-ভাঁজে

ছিঁড়ে ফেলে, নিজেরা তোমার মধ্যে অদ্ভুত আলোতে
হ'য়ে ওঠে আকাশ, অরণ্য আর আকাশের তারা—
যা দেখে, হঠাৎ কেঁপে, আমাদেরও ইচ্ছে করে অন্য কিছু হ'তে।

প্রেমিকারা

মেয়েদের হাসির প্রস্রবণ শুনবে না আর।

হালকা পাখির ঝাঁক, বাল্যসখী লোটন শার্লটে,
জ্যোছনা-মাখা ভোরবেলা পাপড়ি-ফোটা যার লাল ঠোঁটে
একবার আঙুল ছুঁইয়ে শুধু খুলেছিলে দিনের দুয়ার—

তারাও ত্বরিতে হ'লো সন্তানের সজ্ঞান শিকার,
তুলে নিলো যা পেলো হাতের কাছে ; খোলা জানালায়
পর্দা টেনে, ছোট্ট ঘুমের পরে হাওয়ার চীৎকার

শুনে-শুনে ডুবে গেলো অন্তহীন দৈনিক নালায়।
হায়, তবে কখন প্রেমের লগ্ন—যে-মন্ত্রের বলে
উষার অভ্যুদয়, সে-ই যদি রমণীয় ছলে

ছিঁড়ে নেয় বাড়ন্ত জাগরণের সব ক-টি কম্পমান পাতা ?
—যাও, মেয়ে, জীবনের খাদ্য হও ; তারপর যখন তোমার
যুবক-ছেলেরা দূরে স'রে গেছে—হে প্রেয়সী, হে কুমারী-মাতা,

ফিরে এসো তখন ক্রন্দসীর অন্ধকারে রাঙিয়ে আবার।

ঋতুর উত্তরে

শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন, আমি এতদিনে
তোমাদের বিরাট খামখেয়াল জয় ক'রে, হৃদয়সন্ধ্যায়
নিয়েছি সুযোগমুক্ত, হৃতভাগ্য শূন্যতারে চিনে—

আমি, মৃত, নিশ্চিত, ভবিষ্যময়, প্রশ্নের অতীত।
পউষে ফাল্গুনে গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো অন্যায়
আমারে বেঁধে না আর ; বড়ো জোর বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার সম্বিৎ

এঁকে যায় সামান্য গণিতচিহ্নে পঞ্জিকার পালা—
যেন এক পুরোনো প্রাসাদে শুধু অনুপস্থিতি
দেখায় আঙুল তুলে ঘরে-ঘরে মরচে-পড়া তালা।

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন হেমন্তে বিলীন ;
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মি-জলা পশ্চিমের স্মৃতি—
সব মিশে অন্ধকারে ভ'রে দেয় আলোর পুলিন :

শুধু স্বপ্নে শুনে-শুনে একতাল, ঋতুহীন সমুদ্রের স্বর—
নিঃসঙ্গতা ! জেনেছি তোমারই নাম শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বৎসর।

মধ্য-সমুদ্রে

বলো, কিছু বলো ! আমি অফুরান কান পেতে আছি।
মেঘে-মেঘে বেলা যায় ; যারা ছিলো প্রাক্তন আকাশে
'দিন', 'রাত্রি', 'আলো', 'ছায়া'—তারা এক নির্বোধ উচ্ছ্বাসে
দিগন্তে ডুবিয়ে দিয়ে পৃথিবীর প্রতীচী ও প্রাচী

নিতান্ত স্বাতন্ত্র্যহীন সমতায় করে ছলোছলো—
যেমন, যাবার মুখে, যানস্রোত, সৌধ, সেতু, প্ল্যাকার্ড-দেয়াল,
সব, তার আপন যাথার্থ্য ভুলে, অব্যক্তের করুণ রুমাল
হ'য়ে ঝ'রে যায় পথের দু-ধারে।···বলো, কিছু বলো।

কিছুই অভাব নেই, যে তোমার অভাবে অজ্ঞান।
হাসে, নাচে, খেলে, বলে, মেনে নেয় নির্ভুল পৌঁছনো,
জানে ওরা, বিশ্বস্ত কম্পাস-কাঁটা, বেতারবিজ্ঞান :—

আমার হৃদয় হানে জাহাজ-ডুবির হাহাকার,
ধ্রুবতারা মুছে যায়, কোথাও উত্তর নেই কোনো—
যদি-না তোমারই বাণী সমুদ্রের, বাতাসের বর্বর চীৎকার !

ল্যাণ্ডস্কেপ

ওরা সব নিয়েছিলো ভাগ ক'রে—দেবতা, মানুষ, অবতার,
অজন্তা, নোতর দাম। ধাপে-ধাপে, স্বর্গের সিঁড়িতে,
যুযুধান রাক্ষস কিন্নরগণ ঐকতানে তুলেছে চীৎকার—
'ঈশ্বরে আবৃত বিশ্ব !' তুমি এলে অনেক দেরিতে।

প্রথমে পা টিপে, চুপে। যে-হাসির মেলেনি তুলনা,
তার পিছে, ধূমল ছায়ার পুঞ্জ, পল্লব, আকাশ ;
যেমন জ্যোৎস্নার জলে ডুবে যায় মেঘের ঝুলনা
চাঁদেরে ভাসিয়ে দিয়ে। কত ধীরে তোমার উদ্ভাস !

মৃগয়া, বনভোজন, প্রাসাদের প্রমোদ ছাড়িয়ে
খুঁজে পায় যদি-বা নগরহীন প্রান্তর, বাতাস,
চিমনির ধোঁয়ায় তবু প্রশ্ন ওঠে—'ও-কুটিরে কাদের আবাস ?'

উত্তরে, নির্মম হাতে, অবশেষে ঈশ্বরে তাড়িয়ে
চরাচরে সেজান ছড়িয়ে পড়ে, ভ্যান গ-র যন্ত্রণা,
এবং রাজত্ব, জয়, বরমাল্য। এবং বন্দনা।

[বালজাক, তাঁর সমসাময়িক এক শিল্পীর আঁকা একটি শীতের দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন : 'সুন্দর ছবি। কিন্তু ঐ কুটিরে কারা থাকে ? কী করে তারা ? কীভাবে ? আর নিশ্চয়ই তাদের দেনা আছে অনেক ?']

'ফ্ল্যার ডু্য মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

আলবাট্রস

মাঝে-মাঝে, সকৌতুকে, নাবিকেরা বন্দী করে তারে।—
বিশাল আলবাট্রস, সমুদ্রের বিহঙ্গপুঙ্গব,
যে চলে, অলস ভঙ্গে, পার হ'য়ে বিষাক্ত পাথারে,
জাহাজের সহযাত্রী, সঙ্গদাতা, পথের বান্ধব।

যে-মুহূর্তে ওরা তাকে ধ'রে এনে রাখে পাটাতনে,
লজ্জায় বিকল এই নীলিমার সম্রাট তখনি
বিরাট, করুণ, শুভ্র ডানা তার, ক্ষুব্ধ নিপাতনে-
নাড়ে যেন দাঁড়-ভাঙা, অসহায়, সন্ত্রস্ত তরণী।

এই সে-আকাশযাত্রী, কত রূপ ছিলো সম্প্রতিও!
অপ্রতিভ কুশ্রীতায় প্রহসন-পুত্তলি এখন!
কারো বা খুঁড়িয়ে-চলা বিদ্রূপে সে অনুকরণীয়,
অথবা হুঁকোর নল চঞ্চুপুটে দেয় কণ্ডূয়ন!

—মেঘলোকে যুবরাজ! এইমতো, কবিও হেলায়
তুফানে ঝাপট দেয়, ব্যর্থ করে কিরাতের ফলা;
কিন্তু এই মৃত্তিকার নির্বাসনে, উল্লোল মেলায়
মহান ডানার ভারে অবরুদ্ধ হয় তার চলা!

প্রতিসাম্য

প্রকৃতি, মন্দির এক; স্তম্ভরাজি, প্রাণের কম্পনে
মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট প্রলাপে দেয় সংকেত ছড়িয়ে;
সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে
যে-অরণ্য স্থাথে তারে অনুক্ষণ অভ্যস্ত নয়নে।

বহু ভিন্ন প্রতিধ্বনি—দূরাগত, গভীর, অন্বর,
অবশেষে খুঁজে পায় অন্ধকার, গাঢ় সমতান,
নিশীথের মতো ব্যাপ্ত, স্বচ্ছতার মতো মহীয়ান—
সেইমতো বর্ণ, গন্ধ পরস্পরে জানায় উত্তর।

কোনো-কোনো গন্ধ যেন অর্গ্যানের নিস্বনে কোমল,
মাঠের সবুজে মাখা, শিশুর পরশে সুখময়;
অন্যেরা—বিজয়ী, খিন্ন, কলুষিত, ঐশ্বর্যে উচ্ছল,

এনে দেয় অসীমের আদিগন্ত বিরাট বিস্ময়—
আম্বর, কস্তুরী, ধূপ, পরিকীর্ণ গম্ভীর লোবান
গুঞ্জরে আনন্দময় আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের গান।

পণ্য কবিতা

কবিতা, মানসী, তুই প্রাসাদের উপাসক, জানি।
কিন্তু বল, যখন প্রদোষকালে, হিমেল বাতাসে,
নির্বেদে, নীহারপুঞ্জে জানুয়ারি কালো হ'য়ে আসে—
নীলাভ চরণে তোর তাপ দিবি, আছে তো জ্বালানি?

মর্মরে নিটোল তনু; কিন্তু তার পুনরুজ্জীবন
হবে কি বাতায়নের রন্ধ্রে বেঁধা দীপের শিখায়?
যেমন রসনা নিঃস্ব, সেইমতো শূন্য পেটিকায়
ভরাবি, আকাশ ছেঁকে, নীলিমার উদার কাঞ্চন?

না, তোরে যেতেই হবে, দিনশেষে অন্ন জোটে যাতে,
মন্দিরে, দাসীর মতো, আরতির কাঁসর বাজাতে,
যে-মন্ত্রে বিশ্বাস নেই, মুখে তা-ই জপ ক'রে যাবি,

কিংবা, উপবাসী তুই, প'রে বিদূষকের বসন,
না-দেখা চোখের জলে ভিজিয়ে রঙিন প্রহসন,
ইতর জনগণের তিক্ততায় আমোদ জোগাবি।

পূর্বজন্ম

সরল স্তম্ভের সারি অলিন্দের বিরাট নির্ঝর,
রঞ্জিত সিন্ধুর সূর্যে অন্তহীন রঙিন শিখায়,
সন্ধ্যারাগে কঠিন গুহার মতো—দৃপ্ত, অতিকায়—
আমি সেই মায়ালোকে কাটিয়েছি হাজার বৎসর।

আকাশের চিত্রাবলী তরঙ্গের বেগে ওঠে দুলে,
সে-গূঢ় গম্ভীর ছন্দে মিশে যায় অচিরে আমার
নয়নে প্রতিফলিত সূর্যাস্তের বর্ণের সম্ভার,
পরম ক্ষমতাময় সংগীতের কলতান তুলে।

সেখানে পেয়েছি আমি ইন্দ্রিয়ের প্রশান্ত বিলাস,
নীলিমার কেন্দ্রে ব'সে, চারদিকে উজ্জ্বলতা, গতি,
আর নগ্ন দাসীদের গন্ধভারে মন্থর প্রণতি—

যাদের অনন্য ধ্যান, অবিরল সেবার প্রয়াস,
তালপত্র সঞ্চালনে, সে-গোপন দুঃখের উদ্ধার
যার তাপে তিলে-তিলে অবসন্ন হৃদয় আমার।

আদর্শ

ফ্যাকাশে, মরচে-পড়া, পটে-আঁকা রূপসীর দল,
অন্তঃসারশূন্য এই শতকের শঙ্কিত সঞ্চয়,
পাদুকায় বদ্ধপদ, কাস্টানেটে আঙুল চঞ্চল—
এরা নয় তোমার কামের তৃপ্তি, হে মত্ত হৃদয়!

থাকুন নায়িকাদের কাকলিমুখর হাসপাতালে
গাভার্নি[১], সবুজ কবি, পীত পাণ্ডুরোগের চারণ,
বৃথা খুঁজি এই সব অতি ম্লান গোলাপের গালে
আমার আরাধ্য ফুল—লজ্জাহীন, শোণিতবরণ।

অতলগহ্বর এই হৃদয়েরে জানায় সংকেত
দুষ্ক্রিয়ায় নিষ্পলক, লেলিহান লেডি ম্যাকবেথ,
যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন ঈস্কিলস, তার আবির্ভাব ;

কিংবা মিকেলেঞ্জেলোর কন্যা সেই, উজ্জ্বল শর্বরী,
অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁকা, ধ্বংসহীন শান্তির অপ্সরী,
দেবতা ও দানবের ভোগ্য যার কান্তির নিঃস্রাব।

দানবী

সে-দূর অতীতে, যবে প্রকৃতির মদমত্ত রতি
জন্ম দিতো প্রতিদিন অতিকায় অসুর উত্তাল,
আমার সঙ্গিনী ছিলো মনঃপূত দানবযুবতী,
আর আমি, রানীর চরণতলে, বিলাসী বিড়াল।

তার দেহ-মানসের যুগপৎ পুষ্পল বিকাশে
বেড়েছি বন্ধনহীন, মগ্ন তার প্রচণ্ড খেলায়,
এবং সজল তার বাষ্পাকুল চোখের আকাশে
খুঁজেছি রহস্যময় হৃদয়ের বিদ্যুৎ-জ্বালায়।

১। Paul Gavarni (১৮০৪-৬৬) : ফরাশি ব্যঙ্গ-চিত্রকর। এঁর প্রকৃত নাম Hippolyte Sulpice Guillaume Chevalier (ইপলিৎ সুলপিস গীওম শেভালিয়ে)। প্যারিসের বোহিমীয় ও ছাত্র-জীবনের চিত্রাবলীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বোদলেয়ার একটি প্রবন্ধে তাঁকে' dandyism-এর কবি' ব'লে অভিহিত করেন।

ঘুরেছি বন্ধুর গাত্রে, অপরূপ অঙ্গের সান্নুতে,
আদরে উঠেছি বেয়ে ধাপে-ধাপে বিরাট জানুতে ;
কখনো, গ্রীষ্মের দিনে, জরতপ্ত সূর্যের মূর্ছায়

পীড়িত সে, প্রান্তরে বিস্তীর্ণ হ'য়ে শুয়েছে যখন,
ঘুমিয়েছি অনায়াসে তুঙ্গ তার স্তনের ছায়ায়
পর্বতের পদপ্রান্তে শান্ত এক পল্লীর মতন।

দূরাগত সুবাস

যখন, দু-চোখ বুজে, হেমন্তের আতপ্ত সন্ধ্যায়,
পান করি তোমার আকৃতিময় স্তনপরিমল,
অকস্মাৎ উন্মীলিত, একতাল তপনে সজ্জল,
পুলকিত পুলিনের বহ্নিরাগ নয়ন ধাঁধাঁয়।

সে-অলস দ্বীপেরে, প্রকৃতি দেয় অজস্র ধারায়
মধুর ফলের গুচ্ছ, অনুপম উদ্ভিদের ভিড়,
ক্ষীণাঙ্গে ক্ষমতাময় পুরুষের সুঠাম শরীর,
অপরূপ সরলতা মেয়েদের চোখের তারায়।

তোমার গন্ধের যানে খুঁজে পাই মোহন মণ্ডল :
বন্দরে অনেক পাল, মাস্তুলের ব্যাপক জঙ্গল
এখনো রয়েছে ক্লান্ত সমুদ্রের উতল বাত্যায় ;—

এদিকে তেঁতুলগাছে সঞ্চালিত সবুজ আঘ্রাণ
নিশ্বাস আকুল ক'রে, নেমে আসে আমার আত্মায়
যেন দূর বাতাসে স্বনিত কোন নাবিকের গান।

আলাপ

হেমন্তের সুন্দর আকাশ তুমি, আরক্তবরন !
অথচ সিন্ধুর মতো ফুলে ওঠে আমার বিষাদ,
এবং ভাটার টানে রেখে যায় কর্কশ লবণ—
অধরে স্মৃতির জালা, কর্দমের পিচ্ছিল আস্বাদ।

—মূর্ছিত আমার বক্ষ ; তুমি বৃথা স্পর্শ করো তারে ;
যা চাও, প্রেয়সী, তারে নারীগণ, মদপরায়ণ,
ছিঁড়েছে প্রখর দাঁতে, নিষ্করুণ নখের প্রহারে।
খুঁজো না হৃদয়, তারে শ্বাপদেরা করেছে ভক্ষণ।

আমার হৃদয় এক জনতায় বিদীর্ণ প্রাসাদ ;
সেখানে মাৎস্যামি, হত্যা, চুল-ছেঁড়া পাগল চীৎকার !
—ছড়ায় তোমার স্তন নগ্নতার সুরভি সংবাদ !···

হে সুন্দর, আত্মার হাতুড়ি, হানো অমোঘ উদ্ধার !
উৎসবের মতো দীপ্ত ঐ চোখে হুতাশন জেলে
দগ্ধ করো ছিন্ন চীর, জন্তুরা যা রেখে গেছে ফেলে।

আধ্যাত্মিক উষা

আদর্শ দংশনময়, আরঞ্জিত অরুণ প্রলেপে
পা টিপে যখন ঢোকে লম্পটের নির্গত নিশায়,
সে কোন গোপনচারী রহস্যের প্রতিহিংসায়
দেবতার উদ্বোধনে পাশবিক সুপ্তি ওঠে কেঁপে।

পতিত মানুষ, যার স্বপ্নে শুধু শাশ্বত যন্ত্রণা,
তারে এই আকাশ, অপ্রাপণীয়, গহ্বরের মতো
অলৌকিক নীলিমায় আকর্ষণ করে অবিরত।
সেইমতো, হে দেবী অমলসত্তা, আমার সাধনা,

নির্বোধ ভোজের শেষে ধূমময় উচ্ছিষ্টের পারে
বিস্ফারিত চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি, বিরতিবিহীন,
তোমার সুন্দর স্মৃতি আরো স্বচ্ছ উদ্ভাসে রঙিন।

সূর্য ধীরে দেখা দেয়, মোমবাতি ডোবে অন্ধকারে ;
তেমনি, হে বিজয়িনী, স্মৃতিপটে তোমার উত্থান
মনে হয় জ্যোতির্ময় তপনের অমৃতসমান।

দুই বোন

উদার, সৌজন্যময়ী, আছে দুই মনোরম নারী,
লাম্পট্য, এবং মৃত্যু—স্বাস্থ্যবতী, চুম্বনে মহান,
ছিন্নভিন্ন বসনের অন্তরালে শাশ্বত কুমারী,
নিয়তগর্ভিণী, তবু কোনোদিন জন্মে না সন্তান।

কবি, সে অসুরপন্থী, অর্ধাশনে অমাত্যপ্রবর,
গার্হস্থ্যের চিরশত্রু, বন্ধু তার নরকের তাপ,
কবর, গণিকালয়, তার জন্য সাজায় বাসর,
যে-শয্যারে কোনোদিন মলিন করেনি মনস্তাপ।

কদাচারে অতিপ্রস্থ, বরদাত্রী যেন দুই বোন,
কফিন, নিকুঞ্জকোণ ঘুরে-ফিরে আনে উপহার
ভীষণ সম্ভোগ আর আর্তিময় দুঃখের সম্ভার।

লাম্পট্য, কদর্য হাতে গোর দেবে আমারে কখন ?
আর মৃত্যু, আকর্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী, কখন মেশাবে
তোমার সাইপ্রেস সেই বরণের বিষাক্ত প্রভাবে ?

নর্তকী সাপিনী

কী যে ভালোবাসি, প্রেয়সী, তোমার তনুবিতান !
—অলস অঙ্গ-চালনে
মনোহর ত্বক রেশমের মতো কম্পমান
রশ্মির প্রতিফলনে !

সাগরের মতো গভীর, সুরভি তোমার চুলে,
যেখানে অনবরত
নীল, পাটকেল ঢেউ জেগে ওঠে বাউণ্ডুলে,
তিক্ত স্মৃতির মতো—

সেখানে আমার স্বপ্নে আতুর আত্মা
ভোরের হাওয়ার টানে
জাহাজের মতো জেগে উঠে করে যাত্রা
সুদূরের সন্ধানে।

অয়, মধুর কিছুই বলে না চোখের খনি ;
কেবল অতল নেশা
জ্বলে যায় যেন ঠাণ্ডা, কঠিন, যুগল মণি,
লোহায়, সোনায় মেশা।

অথচ, বিলোল রূপসী, কথার অজস্রতা
তোমার চলার ছন্দে,
যেন সুন্দর সাপিনী সোহাগে নৃত্যরতা
অদ্ভুত জাদুমন্ত্রে।

শৈশবে ভরা, মন্থর, ঐ ছোটো মাথায়
ভাবনার তারতম্য
তরুণ হাতির মদির, কোমল শিথিলতায়
খুঁজে পায় ভারসাম্য।

এবং তোমার তনুর মধুর আন্দোলনে
তন্বী তরণী চলে,
গলুই ডুবিয়ে, ঋজুবঙ্কিম আবর্তনে,
ঘূর্ণিকুটিল জলে।

দর-গলমান গ্লেসিয়ারে জাগে প্রকম্পন
তরঙ্গে বেগ আনতে,
তোমারও তেমনি উঠে আসে যবে নিষ্ঠীবন
ফেনিল দাঁতের প্রান্তে,

মনে হয় আমি পান করি কোনো বোহেমিয়ার
তীব্র, বিজয়ী মদ্য—
তরল আকাশে লক্ষ তারার অন্ধকার
অথবা হৃদয়ে লব্ধ।

অতিশয় লাস্যময়ীকে

রমণীয় কোনো দৃশ্যছবির মতো
ভঙ্গি তোমার, ললাটের আলো-ছায়া ;
হাসি খেলে মুখে, যেন সে সতেজ হাওয়া
স্বচ্ছ আকাশে বেড়ায় ইতস্তত।

স্মিত, বন্ধুর গাত্রের ধাপে-ধাপে
যে-মেদকোমল সোনার স্বাস্থ্য বিলসে,
তা দেখে তাদের সবল দৃষ্টি ঝলসে—
তুমি ছুঁয়ে যাও আস্তে, যে-সব মনস্তাপে।

তোমার প্রতুল প্রসাধন-পারিপাট্যে
ইন্দ্রধনুর তুমুল প্রতিধ্বনি ;
তা দেখে কবির মনের আঁধার খনি
জ্ব'লে ওঠে কোন ফুলের নৃত্যনাট্যে।

মূঢ় বসনে কত না রঙের চিহ্ন
তোমারই চপল মনের চিত্রকল্প ;
মূঢ় রমণী! মোহিনী নির্বিকল্প!
যত ভালোবাসি তত মানি তোরে ঘৃণ্য।

মাঝে-মাঝে, কোনো মনোহর উদ্যানে,
বিছিয়ে আমার পাণ্ডুরোগের ক্লান্তি,
দেখেছি, সৌর কিরণের উৎক্রান্তি
কঠিন ব্যঙ্গে বক্ষ আমার হানে।

বসন্ত, তার সবুজের আধিপত্যে
আমারে পরম লজ্জা দিয়েছে ব'লে,
ফুলের আমোদ মাড়িয়ে পায়ের তলে
শান্তি দিয়েছি প্রকৃতির ঔদ্ধত্যে।

সেইমতো, কোনো রাত্রে, আমার প্রাণে
বাসনা এগোয়, হামা দিয়ে, নিঃশব্দ—
রতির প্রভাবে প্রহর যখন স্তব্ধ—
তোর তনিমার রত্নের সন্ধানে।

হ'তে চাই তোর ফুল্ল তনুর হন্তা
ক্ষমাশীল স্তনযুগলে আঘাত ক'রে—
এবং উরুর বিস্মিত অন্তরে
দীর্ঘ, কঠিন, ক্ষমাহীন এক ধস্তা।

তারপর—এ কী মধুর অপস্মার !—
ঐ অভিনব, উজ্জ্বলতর ঠোঁটে
সনির্বন্ধ প্রতিহিংসায় ছোটে
আমার তীব্র গরল—বোন আমার !

লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে

লাল চুলের, ফর্শা, একমুঠো
বালিকা, তোর ঘাঘরা-ভরা ফুটো
দেখায় তোরে অকিঞ্চন অতি
এবং রূপবতী।

স্বাস্থ্যহীন তরুণ তনু তোর
ছুলির দাগে চোখে লাগায় ঘোর,
আমারে দেয় মধুরতার ছবি—
আমি, গরিব কবি।

কাঠের জুতোর গরবে তোর, মানি,
লজ্জা পায় উপন্যাসের রানী ;
চলুন তিনি কিংখাবের জুতোয় ;—
ভঙ্গি তোরে জিতোয়।

ন্যাকড়া-কানি ঢাকে না তোর লাজ ;
তার বদলে দরবারি এক সাজ
নিমন্ত্রিত লথা ভাঁজে-ভাঁজে
পড়ুক পায়ের খাঁজে ;

রঙ্গময়, ছিন্ন মোজা জোড়া,
তার বদলে সোনার এক ছোরা
জংঘা তোর যেন মোহন রেখায়
লম্পটেরে দেখায় ;

হালকা গেরো উন্মোচন করুক
দুটি চোখের মতো রে তোর বুক
দীপ্তিময়—লাবণ্যের চাপে
আমরা জলি পাপে ;

নির্বসনের সময় বাহুযুগল
যেন অনেক আরজিতে হয় উতল,
ফিরিয়ে দিতে না যেন হয় ভুল
দুর্জনের আঙুল,

শত সনেট লিখে গেছেন বেলো[১],
বাছাই-করা মুক্তো ঝলোমলো,
প্রেমিক তোর দাসেরা অফুরান
দিক না তোরে দান,

হতচ্ছাড়া কবির দল, খাতায়
নামটি তোর লিখুক প্রথম পাতায়,
কুড়িয়ে নিতে খুঁজুক ছলছুতো
সিঁড়ির চটিজুতো ;—

১। Remi Belleau : ষোড়শ শতকের ফরাসি গীতিকবি।

চটি তো নয়, কোমল এক নীড়,
তার লোভে যে বেয়ারাগুলোর ভিড়,
আড়ি পাতেন ওমরাহেরা নাচার,
এবং অনেক রঁসার![২]

ফুলের চেয়ে আরো অনেক বেশি
শয্যা তোর চুমোয় মেশামেশি,
তোর ক্ষমতার বিপুল পরিমাণে
ভালোয়া[৩] হার মানে!

—অবশ্য তুই এখন ভিখারিনী
ঐ যেখানে চলছে বিকিকিনি,
হাত বাড়িয়ে দাঁড়াস্ চৌকাঠে
শস্তা মালের হাটে;

আহা রে তোর চক্ষু ভরে জ্বালায়
চোদ্দ আনা দামের মোতির মালায়,
সেটাও তোরে—মাপ করো গো মিতে—
পারি না আজ দিতে।

তাহ'লে তুই এমনি চ'লে যা রে,
বিনা সাজে, গন্ধে, অলংকারে,
শীর্ণ দেহে নগ্নতাই শুধু
সাজাক তোরে বঁধু!

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

২। Pierre de Ronsard (১৫২৪-৮৫) : ফরাশি কবিগুরু, প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত।
৩। Valois : ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ রাজবংশ; ১৩২৮ থেকে ১৪৮৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দুটি কবিতা

জ্যোতির্ময় দত্ত

আচাভুয়া পাখি

আমার হৃদয় আবার হ'লো অবাধ্য, অবুঝ।

বাইরে বৃষ্টিতে ঝড়ের ক্লান্ত পাখি সর্বত্র
বাসা খুঁজে ফেরে, অন্ধকারে জোনাকির মতো
কিছু অশিষ্ট বাসনা ভেসে বেড়ায়, আর তোমার
স্বপ্ন রাতের গলিতে বেড়ালের চোখের মতো জলন্ত সবুজ।

আমার বেদনার পরিধি নেই। তোমাকে বাসনার
উপচার অর্ঘ্য দিয়ে নিজে সে সর্বদা জ্বলে,
পূর্ণিমা-ক্লান্ত কৃশ চন্দ্রের মতো দুলে দুলে,
প্রতি রাত্রির আঘাতে ক্ষীণ হ'য়ে, ঝাঁপ দেয় তমিস্র সমুদ্রে।

আমি যদি নির্বিকার হতাম কোনো ভবঘুরে,
উদাসীন বৈরাগীর মতো, যদি ছোঁয়ায় তোমার
এত না অবুঝ হতাম, তবে সময়ের শত ছোঁয়াতেও চাঁদের
মায়ের বুড়ির চেয়ে হতাম না থুরথুরে।

সারা রাত মাতাল এক মিশকালো ঘোড়া
হৃদয়ের জাল ছিঁড়ে ছুটে চ'লে যেতে চায়,
(পাখিরা পাগল হ'লে বুদ্ধি সাজে বোবা বুঝি!)
সারা দেহে তোমার ছোঁয়ায়
পাখা ঝেড়ে গেয়ে ওঠে অবুঝ সেই অসংখ্য পাখিরা।

তোমার অধরে আছে আমার মরন-কাঠি,
আমার মৃত্যুর বীজ নিয়ে তোমার অধর-দোপাটি
উঠলো এত লাল হ'য়ে। ঐ পূর্ণিমার দুধে-ধোওয়া নিষ্কলঙ্ক মুখ
আমার হৃদয়ের আসল অসুখ।

চুক্তি করি এসো এই সময়ের সাথে।
সময় আমার নিষ্ঠুর কশাই, তার আঘাতে আঘাতে
মৃত শুয়োরের চেয়ে মৃততর হোক আমার হৃদয়,
ক্ষতি নেই। শুধু এই হৃদয়ের ফল খেয়ে, বিদ্ধ
পাখির অন্তর এই হৃদয়ের রাঙা ফল খেয়ে সুপুষ্ট সময়
গ'ড়ে দিক সকল কালের সেই মৃত্যুহীন পাখি।

এ কবিতা সেই পাখি, এ সেই বেদনার শিশু।

এ এক অদ্ভুত পাখি,—অদ্ভুত, আচাড়ুয়া।
চেয়ে দেখ হয়ত এ পাখি নয়, সুরও নয়, তবু
এর গানে কত জনে কত কিছু বলে। কেউ ভাবে
মন্থর ছন্দে এর কোনো রাজকীয়
ব্যবধান আছে, কেউ বলে এ জগতে রূপের অভাবে
পলায়নে আশ্রয় এ কোন চন্দ্রাতপ তাঁবু,
কেউ খোঁজে জগতের কোন দূর প্রতিচ্ছায়া,
আর কেউ বলে এ শুধু সবার গোপন স্বপ্নের উপমেয়।

আসলে এ পাখির হীরার হৃদয়। যন্ত্রণায় আমাদের মতো
কখনো কাঁপে না থরোথরো, কোনো তীরে হয় না আহত।

বাসনায় নিরুৎসাহ, কামনায় স্থির,
সময়ের স্রোতে হেসে-খেলে
উঠে আসে আরো ঝলমলে,
উজ্জ্বলতর দেহে। যদিও
সে-স্থানে
মানুষ
স্থবির।

উদ্ভিদ-সাগর

শ্যাওলায় আচমকা আটকে গেলো। বাঘ-হাঙরের দাঁত
কমুইয়ের কাছ থেকে হীরকের মতো এক হাড়
কেটে গেছে নিয়ে। ঝিনুকের মাঝে তার ফ্যাকাশে, মৃত হাত
ঘুমন্ত পায়রার মতো। তলোয়ার মাছ তার পাঁজরার
বাঁ পাশে, এদিকে, সাপের চোখের মতো ছোট্ট এক
গর্ত খুঁড়েছে। সব সমুদ্রের ডুবে-যাওয়া প্রত্যেক
নাবিক কেমন ক'রে যে আটকে যায় এখানে এসে;
এই এক মৃত মানুষের উদ্ভিদ সাগরে আসা সাত রাত ভেসে ভেসে।

যেদিন প্রথম এ শহরে এলাম সেদিন দেখি
এক চড়ুইয়ের একরত্তি এক হৃদয় নিয়ে এক অতিকায় পাখি
তার সদ্যোজাত শাবকটিকে কী স্নেহে খাওয়ায়!
যেখানে সবুজ সমুদ্র গভীর হ'য়ে নীলতম হয়
সেখানে ডুবে-যাওয়া নাবিকের, সমুদ্রের রসায়নে,
প'চে শ্যাওলা-হ'য়ে-যাওয়া হৃদয়ের কোণে

হাঙরের নিষ্ঠুরতায় উন্মত্ত রাত্রের ভয়ংকর স্মৃতি
সে-ছোটো চড়ুইয়েরও। তোমার পাখিরও
ছোটো দুই ডানা কাটা, ঝোলানো রয়েছে কারো
বিলাস-বাগানে সবুজ ডালিমের মতো ; তোমার হৃদয়
কোনো মৃত সমুদ্রে নিহিত প্রবাল, আমার অন্য প্রিয়ার গলায় পুঁতি।

সারা দেশের পথ এই শহরের দিকে।
কালকেই একপাল ভুটানি মেয়েরা এলো উত্তরের থেকে ;
গলায় ভালুক-দাঁতের হার, কানে ইরানি ঢালের মতো দুল ;
কালকেই হয়ত আবার শহরে হাঙরে
ধ'রে নিয়ে ব্যবসায়ে নামাবে। খাটোতর চুল
আর হীনতর ঠোঁটে রং মেখে দরজার ধারে
দাঁড়াবে একপাল হায়েনার মতো।

রাত্রের প্রভাবে
নগরের রূপ বদলালো। নাইজেরীয় অববাহিকার অরণ্যে
দূর হ'তে ভেসে আসা নদীর ধ্বনির মতো সদর রাস্তার
একটানা সুর। আলো নিভে গেলে, বাড়িগুলি দুঃস্বপ্নে
আমার মনে হ'লো কালো, কালো অসংখ্য নীরব মহিষ
যেন এক অন্ধকার মাঠে ব'সে আছে। পথের বিস্তার
কোন এক নিকষ-কালো নিষ্ঠুর সাপুড়ের শিস
শুনে হেলে-দুলে নিশ্চিত-মৃত্যুর-পানে-যাওয়া সাপ। আমি
আর না-পেরে ছুটতে শুরু করি। সেই সাপুড়ে

আমার প্রত্যেক দিকে উন্মাদ সর্পিণীদের ছেড়ে
নিজে সে পশ্চাতে আসছে। চোখ বুঁজে
দৌড়তে থাকি, আর যখন তারা ছিঁড়ে ফেলতে থাকে

আমিও সমর্পণ করি নিজেকে তখন। আমার দেহের ভোজে
আমিই চরম বিলাসী। আর দেখি হায়েনাগুলির হলুদ দাঁতের ফাঁকে

এক চড়ুইয়ের হৃদয়, ছোটো এলাচ ফুলের মতো,
আর চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ে, ছানার জলের মতো, তার সবুজ রক্ত।

সমুদ্র-তীর্থ

শান্তিকুমার ঘোষ

ঊর্মিলা। চোখ আর চলে নাকো দিগন্তবিস্তার ওই সমুদ্রের দিকে চেয়ে
শুধু নীল ফেনিল আবর্ত ঢেউ আমরণ যন্ত্রণার চেয়ে
সৌরতীর্থ কোথা আছে সেইখানে চলো।

ইন্দ্রনীল। ঊর্মিলা, কখনো
তরঙ্গের সাতরঙ দ্যাখো নি কি ধূপছায়া নামে যেন
ঘুম হ'য়ে দুই চোখে ; শৈশব উল্লাসে যেতে
পারো না কি ঢেউয়ে-ঢেউয়ে দূরে চ'লে যেতে
হৃদয়ের শঙ্খ ভ'রে সমুদ্রের সুরে।

ঊর্মিলা। তটভূমি ঢের ভালো,
তার ফুলে দেবতার পূজা দিয়ে আরো আলো
নেব চেয়ে। ইন্দ্রনীল, হাত দাও, চলো সাথে।

ইন্দ্রনীল। জেনো তবু
নীড়ের মমতা বৃথা—ধরে নাকো প্রশস্ত হৃদয় কভু
মাটির সে-ছোটো ঘরে। অনন্ত সমুদ্র চাই—চাই তার আরো…

ঊর্মিলা। অনন্ত সমুদ্র তবু কান পেতে শোনো তুমি তারও
তরঙ্গ উত্তাল বুকে মৃত্তিকার গান বাজে সৃষ্টিময় গান,
মাটির পুতুল ঘিরে চুম্বনে মাতাল সে-ও।

ইন্দ্রনীল। বিশাল প্রপাত-ঢেউ খানখান
করে শুধু তীরতট। হাঙরের তীক্ষ্ণ দাঁতে মৃত্যুর কঠিন শান।

ঊর্মিলা। অসংখ্য প্রবাল জ'মে অন্য দিকে গ'ড়ে ওঠে
দ্বীপময় মহাদেশ। পাখিরা নতুন বীজ নিয়ে আসে ঠোঁটে।

ইন্দ্রনীল। সংহত সৃষ্টির বাষ্প এই সিন্ধুজলরাশি।
এমনই প্রাকৃত বেগ ঝড় দোলা অশ্রু হাসি
মানুষেরও মনে। জীবনের মদে ডুবে লাফ দিয়ে ঢেউ মরে ;
অতৃপ্ত বাসনা তবু হৃদয় মথিত ক'রে
বাঁধ সেতু সব ভাঙে। ঈর্ষা লোভ ঘৃণা দ্বেষ
সনাতন অন্ধকারে কী বিরাট ঢেউ তোলে।

ঊর্মিলা। সেই সমুদ্রের
গভীর অতল থেকে তারা বুঝি মুক্তা আনে
মৈত্রী প্রেম মানবতা।

ইন্দ্রনীল। অন্য তীর্থ নেই তাই। ঊর্মিলা, এখানে
তোমার পবিত্র প্রেম মণিকা আলোক জ্বলে সহস্র ফণায়।
হাত দাও, এসো তবে—তোমার চরণ রাখো সোনা সিকতায়।

ঊর্মিলা। অপূর্ব সমষ্টি এই আলোড়িত জল জানি অমৃত-আধার,
সপ্তাশ্ব সূর্যের রথ রাত্রিশেষে আনে দিন দীপ্ত চেতনার।
পরম মুহূর্তে শুধু প্রণত হৃদয় দোলে তোমার আমার ॥

দুটি কবিতা

সুকুমার রায়

যদি

নির্জন, নিশ্চুপ পোড়ো বাড়ি।
বাতাস বইছে ঘুরে-ঘুরে, নিরালা, সুরেলা মনে।
কোথাও জানলা লুটিয়ে পড়লো,
দরজা খুলে দিলো অন্ধকার কুঠরি।
বাতাস ঘুরে বেড়ায় ঘরে-ঘরে।
কতো কথা সে বলতে চায়—
আমি তার ভাষা কিছুটা বুঝেছিলাম।
নির্দয় সমালোচক,
যদি তুমি অতো কঠোর না হ'তে
আমি তোমাদের শোনাতে পারতাম বাতাসের গান।

কৈশোর

ছোট্ট নাক ; প্রলাপ যেন ভুরু।
ওপার থেকে আষাঢ় আসে,
বৃষ্টি হ'ল শুরু।

আমার বুকে এলোপাথাড়ি ঝড়,
কথার মালা হারিয়ে গিয়ে
মেঘের গুরুগুরু॥

ওরে আমার মন,
দুলিস কেন মন ?

ছোট্ট নাক ; প্রলাপ যেন ভুরু—
তারি মধ্যে আমার মন কাঁপছে দুরুদুরু॥

হাসি তবু হ'লো ইতিহাস

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

যে-হাসি ছিটিয়ে দিয়ে নদীর প্রলাপে
ঢেউগুলি রাতদিন কাঁপে
সে-হাসি তোমার ঠোঁটে ছলনায় বলে—'ভালোবাসি।'
বহু প্রতিযোগী প্রশ্ন ওঠে নিত্য ক্রুর অপলাপে
মন ঘাঁটে ধোঁয়া-ধোঁয়া সংশয়ের রাশি।
ক্রমাগত বলে—কই ? বলো তবে ? বলো, বলো, বলো—
শুনে শুনে নদীজল আরো যেন হ'লো ছলোছলো,
নদীতীর চিরে-চিরে শোনা গেলো তরঙ্গিত হাসি।

অনেক বর্ষার সুর নিঃশব্দে ঝরিয়ে
করুণ কেয়ার ঝোপ সাবধানে সরিয়ে
খুঁজে খুঁজে পেয়েছি যে সংশয়ের সুনীলা নাগিনী
বলেছে সে—সুনিশ্চিত ক'রে কই আজো তো জানিনি
হাসি তা কি ? ছিলো বাকি যতো কিছু
শেষ ক'রে কান্নার চরম রাগিণী
পেরিয়ে অনেক পথ, অশ্রুর সমুদ্র উৎরিয়ে
আছে যে হাসির দ্বীপ বেদনার নামান্তর ব'লে যাকে চিনি।

অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় তারপর কেটে গেছে দিন
মেঘ ফেটে হাসি ফোটে
ভাদ্রের রামধনু আর বার হয় যে রঙিন।
ব্যথা তো পেয়েছি ঢের, কেঁদেছিও অঢেল কান্না
হেন দুঃখ পাইনি তো যার সঙ্গে দেয়া চলে
অরুন্তুদ এ হাসির কিছুটা তুলনা—

ঘিরেছে যা এ জীবনে মুহূর্তের মুখে চিরকালের আশ্বাস
শাশ্বত, ক্ষয়ব্যয়হীন।
ইতি সেই যে হাসির এ জীবনে তবুও যা
বার বার হ'লো ইতিহাস;
প্রতিশ্বাসে সমীরিত সে-হাসির পরিমল
মনে, প্রাণে অস্তিত্বে বিলীন।

চেনা পাখি

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গের হাতে সোনার পদ্মে সন্ধ্যা তখন,
মাটিতে মন্থ···ভীরু হাতে কার আঁকা চন্দন।
মাঝখানে শিশু জারুলের ডালে ছায়া ঘন হয়
সেখানে রাতের কান্নাকে নিয়ে শান্ত চুড়োয়
পুরোনো দিনের ছায়া ছুঁয়ে আসে সেই চেনা পাখি

হৃদয়ে এখন কালের ঘন্ত—কোন সুরে ডাকি?

সে-সুরে পাখির সাড়া পাবো আর নিবিড় সখ্যে
দিগন্তগামী ঢেউয়ে হবে মন সময়চারী,
কোথায় সে-গান?—পুরোনো মেঘের সুদূরে শূন্য,
ছিন্ন স্মৃতির অশ্রুকণায় কান্না তারই।

সাম্প্রতিকেরও মেঘে সেই তার মনের সঙ্গ
এ-আকাশে কই প্রথম দিনের সে-অনুষঙ্গ?
তবুও পুরোনো ছায়া-দীপ চোখে সেই চেনা পাখি।

হৃদয়ে এখন কালের ঘন্ত কোন সুরে ডাকি?

সময়ের সম ফিরে এল ধীরে হৃদয়ের তালে,
সেই চেনা-পাখি উড়ে গেল ফের দূর গতকালে॥

একটি স্বপ্ন

প্রতিমা পাল

কাল রাতে,
হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক টুকরো নীল
আকাশ। দেখলাম দুটি কি তিনটি
শাদা পাখি উড়ে গেল—
হাতছানির ডানা নেড়ে নিজেদের ভাষায়
স্বাগত জানিয়ে। আমি শুনলাম
হেদোর মোড়ে যে-ছোটো ছেলেটা
ধূপ বিক্রি করে, তার মতো গলা;
সেই আশ্চর্য রিনরিনে আর মিষ্টি।
তারপর, আকাশের একটি তারা ছুটে
এসে আমার জানালায় মুখ বাড়ালো;
তার খেয়ালি আলো আমার শাদা
বালিশে।—কোথায় যেন একটা
বেড়াল কেঁদে উঠলো, আর
পোষা কোকিলটা খাঁচায় ঝাপটালো ডানা।
তারপর আর কিছুই
মনে নেই। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম;
হয়তো একবার সেই সোনালি তারাটাকে
ছুঁতে পেরেছিলাম।

দুটি কবিতা

সৈয়দ শামসুল হক

তার মৃত্যু

ইজদানি মারা গেছে বিমানপতনে।
স্পর্ধা ছিল পৃথিবীকে মুঠো ক'রে ধরে
নরম সুগোল এক কমলালেবুর মতো।

মাথাভরা ছিল তার বইয়ের মলাট, টাই, নাম,
আর নকটার্ন ভিউ। সম্ভবত আরো ছিল
গজ দুই নাইলন সুতো।
মারা গেল অল্প বয়সেই
অনেক ওপর থেকে নানাচাপ হাওয়া সাঁৎরিয়ে।

তোমরা এখনো যারা যাবে কোনো চায়ের বিকেলে
সদাশয়া মহিলার কাছে—
(একদিন সমবেত শোক করা গেছে)
'আজকে আসেনি ওরা?'
'চায়ে চিনি নেই?'
কথা আর হাওয়া এই:
'র‍্যাঁবো কি মাতাল কোনো কিশোর লেখক?'
'যাই বলো, ককতো সে বড্ড বেয়াড়া!'
—জেনে রেখো, ইজদানি সূক্ষ্ম দেহে পিছনেই আছে।

খঞ্জনী

আকাশে উদাসী মেঘ ;
মর্ত্যে তুমি বাজাও খঞ্জনী :
ধুলোর বাউল তুমি
তুমি তারে ব্যাপ্ত ক'রে আছো।
নিমের আড়াল আর কামরাঙা ছায়া
সেখানে দাঁড়াও এসে
ছেলেবুড়ো, আধবুড়ো, আইবুড়ো মেয়ে
সকলেই সন্তানের অধিকারে ভালোবাসা বোনে,
তুমি বাজাও খঞ্জনী।

কী স্বাদ ছড়াও তুমি গ্রাম থেকে গ্রামে ?
স্বর্গ কি ভরাতে পারে বাংলার বিকল হৃদয় ?
তোমার গৈরিক ছায়া শান্তি আনে এ রোদ্দুরে, তুমি
লোক থেকে লোকে।

চেতনার গূঢ় মূলে জল দাও, বীজ,
শস্য করো চিরকাল, হাসি দাও কান্নার সময়ে,
উপদ্রুত হৃদয়ের বাঁধ ভাঙো ভক্তির প্লাবনে ;
চিরকাল বাজাও খঞ্জনী ॥

সহজ

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

নখ ভ'রে রক্ত কত, হিংসা শুয়ে চুলে,
প্রিয়তম অন্য মেয়ে কোলে ক'রে তার ;
কুঞ্জশাখা একবার ভারে কেঁপে ওঠে :
মৃত্যু দিয়ে ফিরে আসে দুঃখ নেই আর।...

সাহজিক রূপ এক ছিলো তার আরো।
হিংস্র বিড়ালীর মতো বাচ্চা লুকিয়েছে ;
বায়ু প্রেত পশু পিতা অন্ধকার ঘিরে—
বিশ হাজার লক্ষ লোক তবু ছড়িয়েছে।

যে-নারী ঝর্নার জলে দেখেছিলো মুখ
এ-সন্ধ্যার আয়নায় সে-ও আছে আজ ;
কাকের পালক দিয়ে দীর্ঘ ভুরু আঁকে,
জামার গলায় জলে অজন্তার কাজ।

সাজানো বসবার ঘরে চক-শাদা আলো
ছায়া ফেলে, বিমুক্ত-বোতাম দুটি স্তন ;
কেঁপে উঠে সুপ্ত শিশু বুকে চেপে ধরে ;
নগরে বন্দুক তোলে ক্রুদ্ধ সাইক্লোন।

একটা নষ্ট ফল

নরেশ গুহ

আহা রে, তুই কে ফল অকালে,
কৃপণ ডালে ফলতে গিয়েছিলি ?
কেউ এখানে ফলতে আসে না রে,
খোঁজে না কেউ বেদনা নিরিবিলি।
ভিখিরিদের ভীত পায়ের ফাঁকে,
ব্যাভিচারীর পাপ-মেশানো পাঁকে,
ফুলের বেলা অবহেলায় ঢাকে,
ছি ছি ছাপায় প্রাণের ঝিলিমিলি ॥

তাপ-জুড়োনো ঘাটের বারাণসী,
তুই এখানে ? কী দেখতে যে আসা !
—কাঁকালে-সোনা-নারীতে উর্বশী !
—বিশ্ব ভুলে বিধাতা ভালোবাসা ?
দেহের কোষে যা এনেছিলি, তার
তীর্থে ভিড়ে দলিত সমাচার
পৌঁছবে না ত্রিদিবে, সংসার
বুঝবে না সে-অভিধানের ভাষা ॥

দুটি কবিতা

আশ্বিন

রণেন্দ্রনাথ দেব

বালিহাঁস ফিরে এলো আর বছরের পথ চিনে,
বাতাসে রোদের ঢেউ শেফালি-বোঁটার রসে রাঙা,
ঘুমভাঙা মুখ তুলে চেয়ে রয় দূর চাঁপাডাঙা,
একটু সজল ছায়া দূরতর দিগন্তে দক্ষিণে ॥

নিশাচর

সারারাত ধ'রে
উড়েছে সে ফিকে শাদা কুয়াশায় ঢাকা প্রান্তরে,
ঘুমভাঙা চোখে
ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে এই শূন্য মাঠের কুহকে।
মন যেন পাখি,
ক্ষীণ বাতাসের টানে সঙ্গীহারা নিঃশব্দে একাকী
আবিষ্ট ডানায়
ভেসে গেছে ক্লান্তিহীন, কার্তিকের নীল জ্যোৎস্নায় ॥

একটি ইচ্ছার সংগীত

(ফেদেরিকো গার্সিয়া লর্কা অবলম্বনে)

কবিতা সিংহ

আহা কী বেদনার অপার প্রান্তর
যা-কিছু অপরূপ ঢেকেছে যবনিকা !
বেদনা জানবার বেদনা হানবার,
একটি সন্তান এই তো কামনার ;

এ যেন মনে হয় হাওয়াকে দিতে চাই,
ঘুমোনো চন্দার ফুলের ডালাটাই,
আমার কিছু নেই, আছে তো শুধু এই
তরুণ ফাল্গুন স্বপ্ন সুধা-ধার,
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনার !

তরুণ তুরগের গতিতে ছন্দিত
আমার বাসনার কোমল কোষে গড়া,
সে-আশা নাড়া দেয় মনের ডালপালা
এখনো অন্ধ সে বসনে ঢাকা আছে
আমার উরসিজ, যেন সে শিশু ঘুঘু
ঘুমিয়ে আছে বুঝি ফোটেনি চোখ তার,
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনার !

হে মাটি মৃত্তিকা হও না ঋতুমতী
মুক্তি খোঁজে কার প্রাণের শিশুচারা
বন্ধ্য কুচ যুগ হোক না ধারাবতী
কয়েদি শিরানদী করো না চন্দনা !
বন্দী শোণিতের অসহ যন্ত্রণা !

চেতনামূলে যেন ক্রুদ্ধ মৌমাছি,
কঠিন হুলে তার, হৃদয় আঁচড়ায়,
শোণিতে কামনার যাতনা দুর্বার,
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনার !

যখন ইচ্ছারা এমনি দুর্মর
আশার উর্মিলা উতল উত্তাল,
আসতে হবে তাকে পেরিয়ে দুস্তর
অসীম বাসনার ঢেউয়ের পারাবার
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনার !

নীলাভ সাগরিকা গর্ভ থেকে তার,
লবণ জন্মায় লবণ তার দান
তেমনি প্রজননে শাখায় ফলভার
তরুকে দান করে যুবতী মাটি প্রাণ,
এমনি নিয়মেই চলেছে পৃথিবীর
ফসল ফলানোর প্রাণের উত্থান !
তাই তো আমাদের জরায়ু তাকে ঢাকে,
কোমল পেটিকায় নিজের সৃষ্টিকে
তরুণ শিশুদের যতনে ঘিরে রাখে,
বাদল-মেঘ যেন, মধুর বৃষ্টিতে !
বেদনা যেন সেই মেঘের ঝংকার !
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনার !

একটি ছবি

অর্চন দাশগুপ্ত

জানালার থেকে দেখা : প্রত্যন্তের মাণ্ডল আদায়ী
ত্রিকোণ তাঁবুর রেখা, আকাশের উজ্জ্বল প্যালেটে
মেঘের বর্ণালি আর সকালের স্বাস্থ্যবান রোদে
কোটলার কোনো মেয়ে সুর যেন লোকসংগীতের—
ঘাঘরা, কাঁচুলি আর ওড়নার রঙ আকাশের
তুলির আঁচড়ে টানা ; ওর শাদা খুশির প্রক্ষেপে
এক ঝাঁক প্রজাপতি ঝলোমলো নির্লজ্জ বাতাসে :
জানালার কাচে আঁটা চেয়ে থাকি ভদ্রলোক আমি

আর ভাবি কোটলারই কোনো এক গোয়ালা যুবার
জোয়ান যৌবন বাঁধা ঝটিতটে নীল তহ্‌মাদে,
সন্ধ্যায় যখন ফেরে গেঁহুর খেতের পাশ দিয়ে
মহিষের দল নিয়ে, কোনো এক আরণ্যক রাত
রক্তে ফেলে ছায়া, তার নিষ্ঠুর মুঠির আকর্ষণে
ঘাঘরা, কাঁচুলি আর ওড়নার বাঁধা টুটে পড়ে ॥

[নূতন দিল্লির দক্ষিণতম প্রান্তে লোদি কলোনি এবং নালার ওপারে কোটলা গ্রাম, সেতুবন্ধের মুখে Terminal Tax-এর তাঁবু পড়েছে। কোটলার একটি মেয়েকে প্রত্যেক সকালে দেখি এবং গোয়ালা যুবকটি মাসকাবারে দুধের পয়সা নিতে আসে আর একটি সিগারেট ধরিয়ে গল্প ক'রে যায়। ওর তহ্‌মাদ (উচ্চারণ অনেকটা তাম্মাদ্) বা অনেকটা লুঙ্গির ধরনে পরা আঁটোসাটো পরিধেয় কোমরের সামনে অদ্ভুতভাবে টান ক'রে বাঁধা।]

জোহরার জন্য

শামসুর রহমান

এতকাল ছিলাম একা আর ব্যথিত,
আহত পশুর অনুভবে ছেঁড়াখোঁড়া।
দুর্গন্ধ-ভরা গুহাহিত রাত নিষ্ফল ক্রোধে দীর্ণ,
শীর্ণ হাহাকার ছাড়া গান ছিল না মনে,
জানি প্রাণে ছিল না সতেজ পাতার কানাকানি
—এমনকি মরুভূমির নির্মম তীব্রতাও ছিল না ধমনীতে,
স্বপ্ন ছিল না,
ছিল না স্বপ্নের মতো হৃদয়।

এই উন্মথিত সময়ের আকাশ চিরে যাবো
—এমন সাহসী ডানা ছিল না আমার।
রাত্রিময় আকাঙ্ক্ষাগুলো বেড়ে ওঠেনি সজীব গাছের ছন্দে,
দমকা বাতাসের আনন্দে নেচে ওঠেনি বুকের তারা।
শুধু রূঢ় অনিশ্চয়তার পাথরে
এত কাল ধ'রে ক্ষয়ে গেছে দিনগুলি, রাতগুলি।
মৃত্যুপ্রতিম স্থবির সরীসৃপ নিয়ে
আমি বিব্রত, বিপজ্জনক।

বিশ্বাসের কোনো ঐন্দ্রজালিক তারা
আলো বিলোয়নি সত্তায়, তবু
উদ্ধারের বাসনায় গ'লে প্রার্থনা হয়েছি কতদিন।

অনিদ্রার বিভীষিকায় তুমি এলে
—অনন্তের একবিন্দু আলো—

বাহুতে উজ্জীবনের শিখা, উদ্ধারের মুদ্রা উন্মীলিত।
দমকা বাতাসের আনন্দে কেঁপে উঠলো বুকের তারা ;
শশকের উৎকণ্ঠা নিয়ে তোমাকে দেখলাম,
রূপালি উর্ণাজালের শত্রুতা সাধলো
দুরন্ত উদ্দাম একরাশ চুল।

কে জানতো এই খেয়ালি পতঙ্গ, শীতের ভোর,
হাওয়ায় হাওয়ায় মর্মরিত গাছ,
ঘাসে-ঢাকা জমি, ছায়া-মাখা শালিক
প্রিয় গানের কলি হয়ে গুঞ্জরিত হবে
ধমনীতে, পেখম মেলবে নানা রঙের মুহূর্ত !
কে জানতো লেখার টেবিলে রাখা বাসি রুটি
আর ফলের শুকনো খোসাগুলো
তাকাবে আমার দিকে অপলক
আত্মীয়ের মতো ?

মঞ্জুশ্রী

আবুল কাশেম রহিম উদ্দীন

নামের দক্ষিণ তটে যে-শব্দের মদির বিন্যাস
তোমাকে ঘোষণা করে,
স্মরণের সমুদ্র ফেনায় নাচে আলোর মতন,
কিংবা কোনো কৃষ্ণপক্ষ রাতের ওপারে
উষার কুসুমে কাঁপা প্রজাপতি পাখার মতন
যে-শব্দ প্রকাশ করে স্বরূপ তোমার,
তাতে আমি হইনি বিহ্বল !
কারণ তোমাকে চিনি ; তোমাকে দেখেছি।
আজকে আমার চোখে তাই,
তোমার অস্তিত্বে ম্লান—ম্লান বুঝি পৃথিবীর সব উপমাই।

শহরের ক্ষিপ্ত ইন্দ্রলোকে
ছন্দসী নূপুরে আর ইন্দ্রমুগ্ধ মুদ্রার বিলাসে
অনেক ইন্দ্রের চোখে যে-নেশা ছড়াও,
সে-নেশায় আতুর হয়নি আজো আমার অন্তর !
কারণ তোমাকে চিনি, তারো চেয়ে আরো বেশি
আরো তুমি অনেক সুন্দর !

আমার মানসতীর্থে গানের দুর্দিনে
কল্পনার মন্বন্তরে তোমার উজ্জ্বল মুখ
ধানের শিষের মতো ভেসে ওঠে সোনায় সোনায় !
তখন তোমাকে কাছে পাই,
যদিও তখন আমি জমিহারা বঞ্চিত কৃষাণ
চোখের বর্ষাদ্ধ মাঠে তোমাকে হারাই।

চৈত্রের হাওয়ার মতো যে-কামনা কখনো-কখনো
জীবনের শুকনো ডালে মাথা খুঁড়ে মরে
অথচ ফোটে না কৃষ্ণচূড়া,
প্রতীক্ষার পাতা ঝরে, ভ্রমরের ব্যর্থ দিন
নগ্ন বৃন্তে করে হাহাকার,
তখনো তোমার মুখ স্বপ্ন শুধু ফুল ফোটাবার !
যদিও সময় বাঁধা জীবনের সহস্র দেনায়,
সে-স্বপ্ন দেখার মন
সাপুড়ের বাঁশি যেন ব্যর্থতার নাগিনী খেলায় !

শহরের এই প্রান্তে
যে-প্রান্তের জীর্ণ বুকে, চোখে মুখে, কাজে ও কথায়
কথা বলে তেরো শ' পঞ্চাশ !
এখানে মৃত্যুর মুখোমুখি
যখন পাথরে পায়ে চকমকি জ্বলে,
মরণের হিংস্র নেশা বাঁচার জিজ্ঞিরে মারে টান,
দীপক রাগের মতো সরোদের উচ্ছৃঙ্খল তারে
হাড়ে হাড়ে নেচে ওঠে প্রাণ !—
তখন যে-প্রান্তে শুধু সুসজ্জিত রাজপথ
মনে হয় বাসর-উন্মুখ,
তোমার দীঘল চোখ সে-প্রান্তের আকাশ-জলসায়
শান্ত ভীরু কটাক্ষের ইন্দ্রধনু এঁকে
এ-প্রান্তের কোনো মনে বাঁচার তাগিদ দিয়ে যায় !
আজ তাই তুমিই কল্পনা,
ম'রেও না-মরা এই জীবনের কঠিন সংগ্রামে
পয়ারের ক্লান্ত লাস্যে কবিতায় সৃষ্টির যন্ত্রণা ।

সেদিন পথের মোড়ে দিনান্তের লজ্জিত আলোয়
হয়তো কোথাও যাবে ব'লে
তুমি ছিলে অপেক্ষায়, তোমাকে দেখেছি
আসন্ন সন্ধ্যার মুখোমুখি
নীরবে প্রতীক্ষমানা শারদীয়া গোধূলির মতো ।
পাশের প্রাসাদে কোনো বেতারের যান্ত্রিক খেয়ালে
সেদিন হাওয়ায় ছিল গান :

অসীম কালের যে-হিল্লোলে, জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে
নাড়িতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান···

সে-গানের সুরের ছোঁয়ায়
সে-মোড়ের ঘোলা নদী ব্যস্ত ঢেউ চেপে
তোমার কপোলে, চোখে আচমকা থমকে দাঁড়ায় ।
এয়োতি আকাশ যেন :
চির নূতনেরে দিল ডাক—
তখন আরেক রূপে তোমাকে দেখলাম
তুমি যেন পঁচিশে বৈশাখ ।

তারপর চ'লে গেলে তুমি
মুছে দিয়ে সেদিনের সে-মোড়ের সব আয়োজন ।
আমার হৃদয়ে, চোখে সহসা ঘনায় :
সিক্ত যুথীর গন্ধবেদনে সে কোন
ব্যর্থ রাত্রি বাইশে শ্রাবণ ।

তবু আশা জাগে মনে, আশা জাগে আমারই এ-দেহে
তপস্যার লুপ্ত কণা রূপ নিয়ে সূর্যের মতন
ব্যর্থতার রাত্রি ছিঁড়ে আকাশে উদয় হবে,—
হয়তো সেদিনও তুমি স'রে যাবে
স'রে যায় সূর্যালোকে শুকতারা যেমন !
তবুও তো ফিরে-ফিরে আসবেই সে-পথের মোড়ে
অনেক শারদ স্মৃতি, গোধূলিতে তুমি আর
মুক্তির আকাশে সেই গান :

অসীম কালের যে-হিল্লোলে, জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে
নাড়িতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান।...

আকাশ-পিপাসা

রবীন্দ্রনাথ সেন

তোমাকে জেনেছি যত
তেমন কি আর কেউ জানে :
দূরের আকাশে
তোমার চোখের নীল
স্বপ্ন বোনে নতুন তারার
এখানে নতুন স্বপ্ন দেখি—
দূরের আকাশ হয় কাছের আকাশ ;
তোমার চোখের নীলে
জেগে ওঠে লক্ষ তারা
লক্ষ সূর্য চোখের গভীরে।

তুমি যদি কাছে থাকো
মিটে যায় আকাশ-পিপাসা
ক্লান্ত পাখিদের মতো
নীড়ের কবোষ্ণ ছায়াতলে—
চোখ রেখে চোখের আকাশে
আমিও ঘুমোতে চাই।
ক্লান্তি-শেষে
বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে
আমিও উঠব জেগে
তোমাকে জাগাবো।

হে সুমিতা, বলো দেখি—
আকাশে মাটিতে আর ঘাসে আর নীলে
নতুন দিগন্ত রেখা
দেখা যায় নাকি !

একটি মুহূর্তের উক্তি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আমার নির্ভর তুমি। যতই হোক না বিড়ম্বনা,
প্রাণের সেতারে আজো জেগে ওঠে নিভৃত ঝংকার ;
মদির কাঞ্চনমূল্যে এ-সুরের যাচাই যন্ত্রণা ;
আমার সত্তায় তুমি কণ্ঠলগ্ন গুপ্ত অলংকার।
বাহিরে বিমর্ষ বেগ, আড়চোখে অনেকে তাকায়,
কেউ ভাবে একরোখা, কেউ ভাবে ভ্রান্ত, শক্তিহীন ;
ফোটাও তুমিই ফুল বিষায়িত প্রাণযুক্তিকায়,
আমার সমগ্র ইচ্ছা একমাত্র তোমার অধীন।

পার্থিব উত্তমে পিষ্ট বরাবর ব্যর্থ ভগ্নরথ,
আমার ললাটে নেই শকুনির পাশার সান্ত্বনা ;
আত্মবিক্রয়ের মূল্যে স্বর্ণলাভ আমাকে সাজে না,
অন্তত তোমারি কাছে এ আমার জন্মের শপথ।

স্বার্থের সন্ধানে ত্রস্ত চামচিকে ছুঁচো ইঁদুরেরা,
আঁধারে তাদের লীলা, জ্যোৎস্নায় আমার ঘোরাফেরা॥

প্রস্তাব

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

জেনো বুনোপথ বন্ধ, প্রকৃতির কুটিল নিয়োগ।
যাবে ? দেখো, বিপজ্জনক রাস্তা : অতর্কে চোলো না :
বিশ্বাস কোরো না গাছে, বুনো ফলে বিষাক্ত ছলনা ;
ঝোপে নাগা দস্যুর গোপন তীর, ঘোরে ক্ষিপ্র চোখ
শিকারী পশুর ; হলুদ পাতার নিচে গূঢ় খাদ ;
উত্তাল দাঁতালো হাতি ডাল ভাঙে ; সাবধান ! পাইথন
গাছের গুঁড়ির মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে—মস্ত বন
ভয়ের জনক, অন্ধ, মৌন মৃত্যু, সঞ্চারী প্রমাদ।

যেয়ো না। বরং চলো গেঁয়ো লোক আলের রাস্তায়,
ধুলো মাখো ঘাম-গায়ে, খাটো ; লাল গামছা মাথায়
হাটে বেচো ক্ষেতের সম্পন্ন লাউ, দু-পয়সা কামাও ;
বিকেলে শাশ্বত তামকূট, কিংবা আর্দ্র যুবতীর
স্বাস্থ্য চাখো ঘাটের চাতালে ; কিন্তু যদি মন স্থির,
চলো লাল বাবার আশ্রমে, মন, গোলমাল থামাও॥

দিশারী

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

'তাকে আমি দৃষ্টি দেবো, হোক না সে সবার দিশারী—'
ব'লে, তার ভ্রূধনুতে তীক্ষ্ণ শর জুড়ে দিলো নারী।
আকাশ সভয়, ম্লান, বিবর্ণ বাতাস ;
দিগ্‌ধূরা লাজ ছুঁড়ে গতি দেয় ছুটন্ত উল্কায়।

বিস্ময়-চকিত আমি স্মিতমুখে সেদিকে চাই,
লজ্জার লাবণ্যে দেখি আঁকা তার গণ্ড-শোণিমায়।

বলি, 'সৌন্দর্যের দ্বীপ—শিল্পীর বিবিক্ত পটভূমি—
আগুন-শিখায় জ্বলো ; দৃষ্টি নয়, শোণিতে তরঙ্গ আনো তুমি।
আমি সে-তরঙ্গ ভেঙে আরো দূর ক্ষুব্ধ সমুদ্রের
সাড়া পাই, ছুটে যেতে চাই, জেনো, নক্ষত্রের দীপ্ত গতিপথে।'

হংসপাদিকা

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পলাতক মুহূর্তের ছবি নিয়ে এসেছে হঠাৎ
এই বন্দী-শিবির সকাল
পাতায় পাতায় আলো ছায়া নীপ মায়া রৌদ্রজাল
তন্ময় তন্বুর তুণে লুটিয়েছে দিগন্তের দূর,
ম্লান সাড়া : একপিঠ খোলা চুলে আঁকাবাঁকা পড়েছে রোদ্দুর।

ফোলা-বুক শাদা-শাদা হাঁসের মতন
কোলে তার পাতা-খোলা বই—
উতল শকুন্তলা,
নীল সকালের হ্রদ অতল অথৈ॥

অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল

সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য কবিতামাত্রেই মানুষের আত্মা থেকে উদ্ভূত, আর সেই হিশেবে প্রত্যেক কবিরই ঐ বিশেষণটিতে অধিকার আছে; কিন্তু আমি এখানে একটি বিশেষ অর্থে 'আধ্যাত্মিক' কথাটা প্রয়োগ করতে চাই। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম: ইন্দ্রিয়চেতনার কবি জীবনানন্দর সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্য যেমন মেরুপ্রমাণ, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের ঘন্দ্বরক্তিম মানসও তাঁর সুদূরবর্তী। তাঁর যে-কবিতাটি প্রথম সাড়া তুলেছিলো সেটি মনে করা যাক: 'সংগতি', ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার মিলন-সংগীত; এই সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলমন্ত্র। এই 'হাঁ'-য়ের দেশ থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিলো, যেখানে আমরা কেউ-কেউ দীর্ঘ ভ্রমণেও ঠিকমতো পৌঁছতে পারিনি, কিংবা স্পর্শ ক'রে থাকলেও টিকে থাকতে পারিনি যেখানে। এটাই তাঁর রচনার প্রেরণা এবং অন্তঃসার: অভাব, প্রশ্ন, তর্ক, বোমা-ভাঙা শহর, বাংলার দারিদ্র্য, মার্কিন সভ্যতা, প্রেমিকার বিচ্ছেদ,—এই সব কণ্টকময় জটিলতা একটি স্থির 'হাঁ'-ধর্মের অন্তর্গত হ'য়ে আছে; রক্তবীজের মতো 'না'-য়ের গোষ্ঠী গজিয়ে উঠলেও তারা এক আরো বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে সুসমভাবে, বিনীতভাবে অবস্থান লাভ করছে, কোনো দুর্জয় বিরোধের জন্ম দিতে পারছে না। একদিকে তাঁর স্বভাবের আপতিক বহির্মুখিতা, অন্যদিকে তাঁর আত্মার নৈষ্ঠিকতা—এই দুটি কারণে, অন্যান্য বিষয়ে যতই গরমিল থাক, তাঁর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র। অবশ্য এই সাদৃশ্য অতিশয় সুকুমার, কোনোরকম স্থূল বিচার তার সহ্য হবে না; যেমন দু-জন অনাত্মীয় বা ভিন্নদেশী মানুষের চেহারায় দৈবাৎ মিল দেখা যায়, কিন্তু নড়াচড়া বা গলার আওয়াজেই ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। অমিয় চক্রবর্তীর 'মতো' আর একজন বাঙালি কবিকে যদি খুঁজে বের করতে হয়, তাহ'লে আর একটু দূর কালে তাকাতে হবে আমাদের; কলাকৌশলের নূতনত্ব, ভাষার

চমকপ্রদ ভঙ্গিমা, এইসব আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর রচনার মধ্যে প্রথিত হ'তে পারলে আমরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করি যে তিনি আর রবীন্দ্রনাথ একই জগতের অধিবাসী, যে-জগৎ অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতার বিশেষ লক্ষণ এই যে তা কোথাও-কোথাও মিস্টিসিজম-এর প্রান্তে এসে পৌঁছয়; বিশেষত তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা অনেক সময় সেই অতি সূক্ষ্ম সীমান্তরেখায় বেপথুমান, যাকে অনুভব করার জন্য প্রায় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।

২

যদিও 'সংগতি' প্রায় পঁচিশ বছর আগে ছাপা হয়েছিলো, তবু 'খসড়া' ও 'এক মুঠো' নামক প্রথম বই দুটিতে তাঁকে আমরা অন্য ভাবে পেয়েছিলাম। 'এঁর মন উজ্জ্বল ও সজীব, ইনি বহু ভ্রমণ করেছেন, চলতি পথের বৈদেশিক ছবি তীক্ষ্ণ তুলিতে তুলে ধরতে ইনি ওস্তাদ—' তখনকার কোনো পাঠক এই রকম বললে খুব ভুল হ'তো না। ব্যতিক্রম ছিলো না তা নয়, কিন্তু মোটের উপর সিনেমা-চঞ্চল চিত্রাবলীর জন্যই তাঁর প্রথম পর্যায় স্মরণীয়; এমনকি, ভৌগোলিক আবেদনের দিক থেকে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বর্ণনাপ্রধান কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা হ'তে পারতো। যতদূর মনে পড়ে, 'অভিজ্ঞানবসন্তে' পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছিলো; 'দুরযানী'র প্রথম কবিতা, 'হারানো ছড়ানো পাগল'ও তাঁর তৎকালীন ভঙ্গির মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু এই পরিবর্তন কত দূরস্পর্শী এবং কতখানি আন্তরিক পরিণতির ফল, তা আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, যতদিন না 'পারাপার' এবং তারপর 'পালা-বদল' প্রকাশিত হ'লো। 'পারাপার'র কবিতাবলী অন্তত দশ বছর ত'রে লেখা; তার পটভূমিতে আছে বাংলা, ভারত, ইওরোপ ও আমেরিকা; তার বিচিত্র সম্পদের মধ্যে কবির মনের অনেকগুলো ঋতু পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। 'পালা-বদল' এক সুরে বাঁধা, কবিতাগুলো যেন একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত, বোধহয় সেইজন্যেই এর এই অর্থবহ নামকরণ। কিন্তু আমরা জানি যে

পালা-বদল আগেই ঘ'টে গেছে ; এবং তার প্রকৃতি বোঝার জন্য এই সাম্প্রতিক গ্রন্থ দুটি একই সঙ্গে পড়া দরকার। ‘পড়া দরকার’ ব'লেই থামতে পারি না ; পড়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাই, কেননা অমিয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কবিতা বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা ব'লে আমি মনে করি।

তাঁর কবিতার যে-সব লক্ষণে প্রথমে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম সেগুলো একেবারে ঝ'রে যায়নি—তা যেতেও পারে না—কিন্তু তার সঙ্গে নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে। এখনো পাওয়া যায় অতি নিপুণ বর্ণনা (‘সান্টা বার্বারা’), একটি মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন তথ্যের তোড়া বাঁধা (‘বিধুবাবুর মত’, ‘১৯০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ’), এবং, বারে-বারেই, পৃথিবীর প্রতি, বিশ্বজীবনের প্রতি তাঁর অম্লান শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এ-সব কবিতার প্রতি আমার প্রীতি ক্লান্তি-হীন, কিন্তু আমি এখানে বিশেষ ক'রে সেই কবিতাবলীর উল্লেখ করতে চাই, যেখানে দেখা দিয়েছে বর্ণনার বদলে মনক্রিয়া, আর যেখানে ‘পৃথিবীকে ভালোবাসি’ এই কথাটা মুখের কথায় বলবার আর প্রয়োজন হয় না। এ-ই তাঁর নূতন সংযোজন—সম্প্রসারণ নয়—এমন একটি কাজ যা তিনি আগে করেননি। যে-বিষয়ে বলছেন, যার ‘বর্ণনা’ করা হচ্ছে ; আমরা বুঝতে পারি তার সাহায্যে তিনি অন্য কিছু বলতে চাচ্ছেন, (হয়তো কখনো-কখনো কথাটা ঠিক ধরতেও পারি না, কিন্তু মনীষার কৌতূহল জেগে ওঠে)—সেইজন্য ব্যবহৃত ছবিগুলো শুধু ছবি আর থাকে না, হ'য়ে ওঠে চিত্রকল্প, কোথাও বা প্রতীক। এর সুন্দর উদাহরণ ‘বৈদান্তিক’, ‘বিনিময়’, ‘ওক্লাহোমা’, ‘লিরিক’ (‘পারাপার’), ‘পালা-বদলে’র ‘অ্যান আর্বার’, ‘ছবি’, ‘অতন্দ্রিলা’। বেছে-বেছে কয়েকটি ছোটো কবিতা উল্লেখ করলাম, দশ থেকে কুড়ি লাইনের মধ্যে গ্রথিত, খাঁটি লিরিকধর্মী। শুধু তা-ই নয়, ‘বৈদান্তিক’ বাদ দিয়ে এর প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতার লেখক হিশেবে অমিয় চক্রবর্তীকে আমরা ভাবিনি এতদিন, ভাববার বেশি কারণও তিনি দেননি। অবশ্য তাঁর ‘বৃষ্টি’ (‘কেঁদেও পাবে না তারে বর্ষার অজস্র জলধারে’), ‘চিরদিন’ (‘আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো’)

—এ-সব রচনার বিরল মাধুর্যগুণের সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছিলাম, কিন্তু উল্লিখিত কবিতাবলীর মধ্যে নূতন একটি বেদনা প্রবেশ করেছে ; ‘সেদিন রাতে যখন আমার কুসুম বোনকে হারাই’-এর মতো শুভ্র বেদনা নয়, তার শান্তির পিছনে রক্তের রং ঝিলিক দেয় যেন, যেমন দিয়েছিলো—অবশেষে—রবীন্দ্র-নাথের ‘শুক্ল রাতে একদিন’ কবিতায়। পূর্বে বলেছি তাঁর রচনায় রক্তমাংসের আক্রমণ সবচেয়ে কম—এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ‘পবিত্র’ তাঁর রচনা ; আলোচ্য কবিতাবলীতেও ভালোবাসার দৈহিক উপাদানের নামগন্ধ নেই ; আরো বেশি : তাদের আসল অভিপ্রায়টাকেই একটি আবছা আচ্ছাদনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; ব্যাপারটা কী, এবং কতখানি, তা পাঠককেই অনুমান ক'রে নিতে হয় ব'লে অসতর্কের কাছে এদের সংবাদ পৌঁছবে না। সাহিত্যে, দৈহিক সংসর্গে অমিয় চক্রবর্তী দুর্বারভাবে পরাঙ্মুখ ; বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যাঁর রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপসর্গসম্পায় কোনো নায়িকাকে একটিবারও দেখা যায়নি সেখানে ; দেহটাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে তিনি শুধু ভাবটিকে রেখেছেন, কখনো-কখনো নামও দিয়েছেন তাকে—কিন্তু সে-সব নামও এক রকমের ছদ্মবেশ, যেমন কিনা এই রচনাগুলিও ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতা। এই ধরনের আরো কিছু কবিতা আমার মনে পড়ছে : ‘পারাপারে’ ‘পরিচয়’ (এই পুরনো সাঁকো, পাথরে বাঁধানো কল্পদেশ), ‘শ্রীমান শ্রীমতী’ (দুজনায় যেতে ঐ নীল সিন্ধু-পাখি-ওড়া তীরে) ; ‘পালা-বদলে’ ‘মিলন দিগন্ত’ (কাছাকাছি ফিরে আসা দুজনের বেদনা বাতাসে) ‘দুই অশ্ব’ (“কেন দু-জনায় তবু ধরণীতে অন্ধ অন্তরাল ?”)—এই সম্পূর্ণ গুচ্ছটিকে আলাদা ক'রে নিয়ে মন দিয়ে পড়লে মানতেই হয় যে বাংলা ভাষার প্রেমের কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অমিয় চক্রবর্তীর প্রাপ্য। দেহের প্রসঙ্গে নির্মমভাবে মৌন থেকেও তাঁর বেদনায়—এমনকি তাঁর বাসনায়—কোনো-কোনো রচনা রঙিন হ'য়ে উঠেছে ; যার উল্লেখমাত্র নেই তাকেও আমরা অনুভব করতে পারি ; এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া বাংলা ভাষার আর কোনো রচনা আমি

জানি না, যেখানে প্রায় কিছুই না-ব'লে অনেক কথা এমনভাবে বলা হ'য়ে গেছে। এবং, রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই, তাঁর এ-সব রচনায় এক রকমের প্রতারক সরলতা বিদ্যমান—আপাতত সহজ, বিশ্রান্ত, ঈষৎ এলোমেলো, ঈষৎ ঝিমোনো গোছের তাঁর লেখা ; যার ফলে, রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন হয়, কথাটা আমরা অনেক সময় ধরতে পারি না, কিন্তু উপলব্ধির শুভক্ষণে দ্বিগুণ আনন্দ পাই। ভিতরে যে-টান পড়েছে, অবয়বের মধ্যে তা সব সময় থাকে না ব'লেই তাঁর কবিতা বহুবার পঠনসাপেক্ষ।

যদি আমরা বলি যে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জগতের উত্তরাধিকারী, যদি মনোভঙ্গিতে ও রচনাপদ্ধতিতেও এ-দু'জনে মিল খুঁজে পাই, তাহ'লে এই প্রশ্নটা বাকি থেকে যায় যে তিনি কোন অর্থে আধুনিক, কিংবা তিনি কী এনেছেন যা রবীন্দ্রনাথে নেই। এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রথমে বলবো যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ পর্যায়ে আধুনিক কবি ; দ্বিতীয়ত, এ-দু'জনের জগৎ মূলত এক হ'লেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রধান কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই—কোনো আধুনিক কবিতেই তা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন, ছাইমার, ইয়াসনায়া পল্যানা : এক-একটি সুদৃঢ় আলাকের উৎস, বলতে গেলে সারা জগতের দৃষ্টি যেখানে বিন্যস্ত—যে-পৃথিবীতে ও-রকম স্থায়িত্ব সম্ভব ছিলো সেই পৃথিবী তর্কাতীতভাবে ভেঙে গেছে : আজকের কবি টি. এস. এলিয়ট রাসেল স্কোয়ারের ব্যবসায়ী এবং স্বদেশত্যাগী, রিলকে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ ও লুক্কায়িত ; এমনকি জর্মন কুলীন টমাস মানকে একাধিকবার আটলান্টিক পারাপার করতে হয়। বাসা ভেঙে গেছে মানুষের ; বুদ্ধিজীবী মাত্রেই উদ্বাস্তু ; 'বাড়ি' নামক ব্যাপারটা একটা আইনঘটিত কল্পনায় পরিণত হয়েছে—এমনকি, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে 'ন্যাশনালিটি' জিনিশটাও তা-ই। এই পরিবর্তিত এবং পরিবর্তমান পৃথিবী বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী সুতীক্ষ্ণভাবে সচেতন ; তাঁর কবিতার পটভূমিকা চার মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে ; তাঁর রচনার মধ্যে যে-মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই সে অনবরত ঘুরে বেড়ায় এবং বাসা-বদল

করে, অস্থিরতার মধ্যেই অন্তরতম গভীরের দিকে চোখে খুলে রাখে। ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে, অবিরল পথিকবৃত্তির ফাঁকে-ফাঁকে উদ্ভিত হ'য়ে উঠেছে এই রচনাগুলি ; কখনো ক্যানসসে, কখনো প্রিন্সটনে, কখনো বস্টনে বা আরিজোনায়, বার-বার যে-'বাসা' বা 'বাড়ি'র খবর পাওয়া যায়, তারা ঐকাহিক ব'লেই উল্লেখযোগ্য। এই জঙ্গমতাবোধ রবীন্দ্রনাথে ছিলো না, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাঁর প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করেনি, তাঁর চেনা জগৎ যে হারিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেও কাব্যের মধ্যে তা স্বীকার ক'রে নেয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। এই স্বীকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী—শুধু দীর্ঘকাল প্রবাসে আছেন ব'লে নয়, স্বভাবেরই প্রেরণায় ; রবীন্দ্রনাথে যে-শানাইয়ের সুর কলকাতার গলির অসংগতিকে মিলিয়ে দিয়েছিলো, তাকে তিনি প্রয়োগ করেছেন আমাদের সমকালীন পরিচিত পৃথিবীর বিবিধ, বিচিত্র, পরস্পর-বিরোধী তথ্যের উপর ; যে-পরিবেশের মধ্যে আমরা প্রতিদিন বেঁচে আছি এবং যুদ্ধ করছি, তাঁর মিলন-মন্ত্র একেবারে তার কেন্দ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে। এই উপাদানের আয়তন ও বৈচিত্র্য তাঁকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে ; রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছেন তার ব্যবহারের ক্ষেত্র আলাদা ব'লে তাঁর কবিতার রস-বস্তুও স্বতন্ত্র ; তাঁর কাছে আমরা যা পাই, রবীন্দ্রনাথ তা দিতে পারেন না।

৩

ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতার দু-একটি উদাহরণ উপস্থিত না-করলে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। 'বিনিময়' কবিতার প্রথম স্তবক :

তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—

ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
তরল হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে ॥

তার বদলে—কার বদলে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই এই কবিতার চাবি লুকোনো। ইওরোপীয় ভাষা হ'লে সর্বনামের লিঙ্গ দ্বারাই সেটা ধরা পড়তো, বাংলায় হয়তো বুঝতে একটু দেরি হয় যে 'সে' মানে কোনো অন্তর্হিতা প্রণয়িণী। তারপর, এটা বোঝামাত্র, সমগ্র কবিতাটির অভিঘাত প্রবল হ'য়ে ওঠে, 'একলা বুকে সবই মেলে'র মধ্যে হাহাকার শুনতে পাওয়া যায়। তেমনি, 'ওক্লাহোমা' কবিতায়—

সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছ কি ৩৫ ২৫-এ?
বিকেলের উইলো-বনে রেড-অ্যারো ট্রেনের হুইসিল
শব্দশেষ ছুঁচে গাঁথে দূর শূন্যে দ্রুত ধেয়া নীল;
মার্কিন ডাঙার বুকে ঝোড়ো অবসান গেল মিশে ॥
অবসান গেল মিশে ॥

এখানো কোনো অস্পষ্ট 'সে'-র উল্লেখও নেই, কিন্তু এই তিন স্তবকের প্রতিধ্বনিত কবিতাটিতে চলতি ট্রেনের বিচ্ছেদের বাতাস এমন জোরে ব'য়ে চলেছে যে আমাদের মনে দুর্বারভাবে জেগে ওঠে কোনো বিদায়ের দৃশ্য—ট্রেন ছাড়বার আগে যা ঘটেছিলো তা অব্যক্ত থেকেও কবিতার পরতে-পরতে বিরাজ করছে। এই বিচ্ছেদের বেদনাই বার-বার অনুভব করা যাচ্ছে অন্যান্য কবিতায়:

পৃথিবীতে লগ্ন ছিল এই মিলনের ঘর
এসেওছিলেম দুজনে—তারপর? ('লিরিক'—পারাপার)

যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে, শুধু
মিনিট খানিকও নয়: দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে ॥ ('অ্যান আর্বার'—পালা-বদল)

চলো, কার্মেলিতা, চলো আবার তোমার নিজ দেশে।
এখানে আসবে কাছে স্বপ্ন-চলনের বেশে
কান্না ঢেউ যোজন যোজন পার হয়ে,.....
এ আসা তো আসা নয়, হঠাৎ যদি বা এই ভিড়ে
বুকের শহর চিরে
শোনো চেনা কণ্ঠ, দেখ চেনা চোখ তবে
মুহূর্তে মুছায় সব শেষ হবে।—.....
দুই জন্ম দুই থাক, মধ্যে সাঁকো পারাপার,
কার্মেলিতা, দেখ এক প্রেম পারাবার ॥ ('পরিচয়'—পারাপার)

আর তারপর 'পালা-বদলে'র 'রাত্রি' কবিতায় 'হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না, দেখি তুমি নেই'—আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'লিপিকা'র 'পরির পরিচয়', এবং বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় মন আবহমানভাবে যে-বিরহের গান গেয়েছে, তার ধারা সমকালীন বাঙালি কাব্যে ছিন্ন হ'য়ে যায়নি। সুখের সঙ্গে মনে প'ড়ে যায়, অন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে যতই ভিন্নধর্মী হোক, 'অর্কেস্ট্রা'ও বিরহের কাব্য, 'বনলতা সেন'ও তা-ই। রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণতা', সুধীন্দ্রনাথের 'নাম', জীবনানন্দর 'আকাশলীনা', অমিয় চক্রবর্তীর 'বিনিময়'—এই সব আপাত-বিসদৃশ কবিতার মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ দেখিয়ে কোনো মনোজ্ঞ আলোচনা কেউ একদিন লিখবেন আশা করি।

৪

আমার পরিসর বেশি নেই, এই আলোচনা কোনো অর্থেই সর্বাঙ্গীণ হবে না, তবু অন্য দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপরিহার্য। একটু পিছনে স'রে যাওয়া যাক, সেই যখন 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'মাটির দেয়াল' বেরিয়েছিলো। সেই সময়ে ঐ পুস্তিকা যাঁরা পড়েছিলেন, তাঁদের চমক লেগেছিলো অমিয় চক্রবর্তীর অন্য একটি গুণপনায়—যাকে, অন্য নামের অভাবে, অগত্যা হাস্যরস বলতে বাধ্য হচ্ছি। বেদনামিশ্রিত হাসি—ব্যঙ্গ নয়,

অভিযোগবর্জিত—নিজের অবস্থাটাকে মেনে নেবার মতো স্মিত প্রসাদগুণ, অথচ নিজেকে অন্য কেউ ব'লে জানবার মতোও বুদ্ধি—এই রকম ভাবসন্নিপাতে তৈরি হয়েছিলো 'বিধুবাবুর মত', ('মতো' নয়) 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', 'মামুলি' (মন রে আমার মন কোন সাধনার ধন হাড়ের বাক্সে'), 'লগ্ন' ('চমকিয়ে ওঠে কবিতায় ডাঁটাসুদ্ধ রাঙা পালং শাক')—হালকা কবিতা, কিন্তু অর্থের দিক থেকে হালকা নয়। এর সবগুলো রচনা 'পারাপারে' দেখতে না-পেয়ে নিরাশ হয়েছি, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণও পেয়েছি সম্ভবত একই সময়ে লেখা 'সাবেকি' কবিতায়—

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।
রাম নাম সত্ হ্যায়
গৌড় বসাকের প'ড়ে রইল ভরন্ত খেত খামার।
রাম নাম সত্ হ্যায়॥……
আমরা কাজে রই নিযুক্ত, কেউ কেরানি কেউ অভুক্ত,
লাঙল চালাই কলম ঠেলি, যখন তখন শুনে ফেলি
রাম নাম সত্ হ্যায়
শুনব না আর যখন কানে বাজবে তবু এই এখানে
রাম নাম সত্ হ্যায়॥

একটি চির-পুরোনো বিষয় লৌকিক ছন্দের দোলাতে নিটোলভাবে নতুন হ'য়ে উঠলো; আরম্ভে 'গেল' কথাটার রেশ-টেনে-চলা আঘাত থেকে শেষ পর্যন্ত মজায় ভরপুর—যদিও বিষয়টা একেবারেই 'মজার' নয়। এত বড়ো দুঃখের কথায় এতখানি কৌতুক যিনি আমদানি করতে পেরেছেন তাঁকে হাস্য-রসিকের চেয়ে বড়ো অর্থেই রসিক বলতে হয়। এই হাসিরই আভাস পাওয়া যায় 'পালা-বদলে'র প্রথম কবিতায় 'হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়' সম্বোধনে।

যদিও 'পারাপার' ও 'পালা-বদল' একসঙ্গে পঠনীয়, এবং দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সুস্পষ্ট, তবু 'পালা-বদলে' কবি আরো অগ্রসর হয়েছেন; প্রথমটিতে

যে-নূতনত্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে দ্বিতীয়টিতে তার সংহত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এবং 'পালা-বদলে' কয়েকটি নূতনতর ধরনও স্থান পেয়েছে: কলাকৌশলে চমকপ্রদ 'অপঘাত' (রবীন্দ্রনাথের 'ফিনল্যাণ্ড ধ্বংস হ'লো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে'র সঙ্গে যেন সচেতন প্রতিযোগিতা ক'রে লেখা); গভীর চিন্তায় ভরা 'সঙ্গ' নামক কবিতা—যাঁরা মনের সম্পদ সৃষ্টি ক'রে থাকেন তাঁরা নিজ-নিজ নির্জনতার মধ্যেও কেমন ক'রে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করেন তারই কাহিনী, এবং 'ইতিহাস' নামক উৎকৃষ্ট এবং একাধিক অর্থে আমেরিকান কবিতার বিস্ময়। আমেরিকার একটি গ্রাম কী ক'রে শহরে রূপান্তরিত হ'লো, দু-পৃষ্ঠার মধ্যে তারই ইতিহাস। বাঁধা ছন্দে লেখা, কিন্তু গদ্যের মতো পড়া যায়। শুধু বিষয়টাই মার্কিন নয়, রচনার রীতিটাও কোনো উৎকৃষ্ট মার্কিন কবির অনুরূপ—কোথাও-কোথাও রবার্ট ফ্রস্টকে মনে পড়ে। কবিতার মধ্যে যে-ঘটনাটা ঘটলো তার জন্য কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপ নেই; লেখক একটিও মন্তব্য করেননি; শুধু একটি পরিচ্ছন্ন বিবরণ দিয়ে গেছেন। ঠিক এই জাতের কবিতা অমিয় চক্রবর্তী আগে আর লেখেননি; বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখেছেন ব'লেও আমায় মনে পড়ছে না। এই ধরনটি তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে যদি ফিরে আসতে থাকে, তাহ'লে আমরা বলতে পারবো যে বাংলা কবিতার জন্য নতুন একটি প্রদেশ তিনি জয় করলেন।

৫

তাঁর ভাষাব্যবহার প্রথম থেকেই অভিনব ও চিত্তহারী; কিন্তু সম্প্রতি তার কোনো-কোনো অংশ বিষয়ে আমার মনে সদ্বিধ প্রশ্ন জাগছে। 'পারাপার' ও 'পালা-বদলে' দেখা যাচ্ছে তল্ প্রত্যয়ের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, ইন্ ভাগান্ত শব্দের প্রতি হয়তো বা একটু অহেতুক আকর্ষণ, এবং বিশেষ্য থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ থেকে বিশেষণ রচনা করবার প্রবণতা। 'উত্তমতা' 'সহজতা' 'সংসারতা', 'আসলতা', 'আপনতা': এদের বিষয়ে প্রথম কথা এই যে

বাংলায়, বিশেষত বাংলা কবিতায়, বিশেষণটাই বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হবার শক্তি রাখে; দ্বিতীয়ত, দেশজ শব্দে তল্ প্রত্যয় সুশ্রাব্য নয়, এবং তৃতীয়ত, 'সংসারতা' বলতে যা বোঝায় তা 'সংসার'-এর মধ্যেই নিহিত আছে, মূল শব্দটাকে যথাযোগ্যভাবে খাটিয়ে নিলেই 'তা' আগমের প্রয়োজন হয় না। অন্য কোনো দিক থেকে এগুলোকে যদি বা সমর্থন করা যায়, 'পুণ্যতা', 'জীবনতা' বা 'সংসর্গতা'র সপক্ষে কী যুক্তি দাঁড়াতে পারে আমি তা ভেবে পাই না। প্রচলিত অর্থে যা ব্যাকরণদুষ্ট তাকে তখনই শুধু মেয়ে নেয়া যায় যখন তার দ্বারা কবিতার কোনো বিশেষ লাভ হচ্ছে, কিন্তু যখন তার ফলে সংবাদে বিভ্রান্তি আসে (যেমন এসেছিলো বিষ্ণু দে-র 'আহা যদি আজ পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ'-এ) কিংবা তা কোনোভাবেই কাজে লাগে না, তখন বোঝা যায় এলিয়ট কেন বলেছিলেন কবিতারও গদ্যের মতো সুলিখিত হওয়া দরকার। 'দূরের স্মরণী বয় **পণ্যতায়** আঁকাবাঁকা ব্যস্ত দ্বীপের মধ্যে'—এখানে 'পণ্যতা'কে সমগ্রভাবে 'merchandise' অর্থে গ্রহণ যেতে পারে, কিন্তু 'তুমিহীন **জীবনতা** তাতে রাঙা হয়ে বেলা নামে', 'সব তার **সংসর্গতা** অনাদি আদিম নীলালোকে', 'বন্ধুর আঙুল নৃত্যে চোখের তন্ময় **ধ্যানতায়**' কিংবা 'বাগানে ফুলের গাছে আমাদের নতুন সংসারে দিলেন **পুণ্যতা** তীর্থ'—এই পংক্তিগুলির মধ্যে এমন কোনো দাবি নেই যা 'জীবন', 'সংসর্গ', 'ধ্যান' আর 'পুণ্য' দিয়ে মেটানো সম্ভব হয় না। 'যৌবনী জনতা', 'চন্দনী ধূপ', 'শিল্পের তন্ময়ী গুরু'; যথাক্রমে 'যৌবন', 'চন্দন' এবং 'তন্ময়' পড়লে অর্থ একই থাকে এবং প্রসাদগুণ বর্তায়। 'স্মরণী', 'আনন্ত', 'আনন্তিক', 'নরঘ্নী'—তরুণ লেখকদের উপর এ-সব ব্যবহারের প্রভাব ভালো হবে কিনা সে-বিষয়েও আমার সন্দেহ থাকলো।

'কবিতা'র সাম্প্রতিক সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দ নিয়ে আলোচনা চলছে। বাংলা ক্রী ভর্সের নমুনাস্বরূপ তাঁর কোনো-কোনো কবিতা দেখানো যেতে পারে, আমি কোনো সময়ে এই রকম একটা মন্তব্য করেছিলাম। আজ সেই কথাটা নতুন ক'রে উঠেছে, কেননা তাঁর সাম্প্রতিক ছন্দোবদ্ধ লেখাতেও

সর্বত্র নিয়মিত পর্ববিভাগ পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ছন্দ-ব্যবহারে তিনি অনেকখানি স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন—এখানে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর আবার একটি সাদৃশ্য ধরা পড়ে—তার ফল মোটের উপর যা দাঁড়ায় তাকে অনেক ক্ষেত্রে ক্রী ভর্স বলাই যুক্তিসংগত।

ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
তাহ'লে
উঠে যাবে। ('ইতিহাস'—পালা-বদল)

অন্যমনস্ক মস্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায়
('ওক্লাহোমা'—পারাপার)

শুতে যাই বুকে ভ'রে শ্রীরাগ ধ্রুপদে গম্ভীর—
('য়ুরোপ জাহাজে'—পারাপার)

এই পংক্তিগুলিতে ছন্দকে যেটুকু বেঁকিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে ছন্দের সীমা লঙ্ঘন করা হয়নি: 'তাহ'লে'-কে চারমাত্রা, 'অন্যমনস্ক' ছয়, এবং 'গম্ভীর'কে বিশ্লিষ্ট ক'রে প্রয়োজনীয় মাত্রা পুরিয়ে নিতে আমাদের আপত্তি হয় না। পক্ষান্তরে এও বলা যায় যে 'তাহ'লে'-তে একমাত্রা কম থাকার জন্যই ওর ব্যঞ্জনা আরো দীপ্তি পেয়েছে। এ-ধরনের উদাহরণ এখানে আমার আলোচ্য নয়। 'থাকবে', 'চলতে', 'বলতে', প্রভৃতি ক্রিয়াপদ পয়ার ছন্দে দু-মাত্রায় আজকাল অনেকেই বিন্যস্ত ক'রে থাকেন; আমার মনে হয় এর ব্যবহার স্বল্প ও সুমিত হওয়া প্রয়োজন, এবং তার উপকারিতা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনবর্ণের উপরেও নির্ভর করে। উদাহরণত, 'পালা-বদলে'র 'এই বৃষ্টি' কবিতায়—

মনের প্রহরী **ভিজছে** ছাতি হাতে নিঃঝুম প্রহরে
শুধু **ভিজতে**, খানিকক্ষণ ধারাবাহী মগ্ন অবকাশে—

চিহ্নিত ক্রিয়াপদ দুটিকে প্রসন্নভাবে উচ্চারণ করা যায় না; 'ভিজছে'-র পরেই 'ছাতি' কথাটায় আরো বেশি হুঁচট খেতে হয়। এ-রকম ক্ষেত্রে, মনে

হয়, পদ্যের তুলনায় গদ্যকবিকার পথই প্রশস্ত ছিলো, বিশেষত অমিয় চক্রবর্তীর মতো গদ্যকবিতায় নিপুণ শিল্পীর পক্ষে। কিন্তু এটা লক্ষ্যণীয় যে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে পদ্যের সংখ্যাই বেশি ; কোথাও-কোথাও তাঁর ছন্দ কারুশিল্পে উজ্জ্বল, এবং অন্য কোথাও একই রচনায় একাধিক প্রকার ছন্দ, অথবা পদ্যের সঙ্গে গদ্য মিশিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রথাসিদ্ধ নামই হ'লো ফ্রী ভর্স। 'পারাপার'-এর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতার ছন্দের মধ্যে 'ভারতবর্ষের আকাশে' পংক্তিটা স্পষ্টত গদ্য (যদি না ওটা মুদ্রাকর বা লেখকের অনবধানতাবশত ঘ'টে থাকে) ; 'ফ্রাইবুর্গের পথে'র কোনো-কোনো পংক্তি যেন পয়ারের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের আমেজ এনেছে ; 'একটি গান শোনা' কবিতায় 'ত্রিশূল স্থির। সুরের শাদা চূড়ো', এ-দুটি পংক্তি পঞ্চমাত্রিক ব'লে মনে হয় ; কিন্তু তারপরেই কয়েকটি পংক্তি গদ্যে লেখা, আবার দ্বিতীয় স্তবকে 'কোলাহল মিলে মিলে যায় ধ্বনির পাপড়ি ঝরে ধ্যানে এলো হাওয়া মরুতাপসিক' এ-সব পংক্তি পয়ারের সুরে পড়তে প্রলুব্ধ হই আমরা। এমনও হ'তে পারে যে লেখক সমস্তটাকেই গদ্যকবিতা ব'লে উপস্থিত করতে চেয়েছেন—সেটা খুবই সম্ভব—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় যেমন প্রত্যেকটি পংক্তিকে পরিষ্কার গদ্য ব'লে চেনা যায়, ভুলেও কখনো ছন্দের সুর লাগে না, অমিয় চক্রবর্তীর রচনা প্রথম থেকেই তার উল্টো পথে চলেছে : অর্থাৎ তিনি সচেতন বা অচেতনভাবে (সম্ভবত সচেতনভাবেই) গদ্যের ফাঁকে-ফাঁকে পদ্যের বিনুনি গেঁথে দেন। বলা বাহুল্য, আগাগোড়া নিয়মিত ছন্দে তিনি অনেক লিখেছেন, স্মরণীয়ভাবেও লিখেছেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে, যেন ইচ্ছে ক'রেই কী-রকম অসম বা বি-ষম পংক্তি ব্যবহার করেন, 'পালা-বদল' থেকে তার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি :

আয়ুক্ষণ মহাবিত্ত, প্রকাণ্ড নিরালা সময়ে ('এরোপ্লেনে')

কী ক'রে এমন দিনের কোমলতা ('দিন')

কত ট্রেনে চলেছিলো, টাইম-টেবিলে ঝাপসা চোখে ('মিলন দিগন্ত')

বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে……('ইতিহাস')

দ্রুত হয় ঝংকারে ঝংকারে গীতাঙ্গনে
তোমার তন্ময় আঙুল ('রাগিণী')

স্বরবৃত্তেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়

সারা বসন্ত কাশ্মীরি বন জাফ্রানি বাস……

তবুও দেখ **সাহারার জিভ বালির প্রখর** ('বিসংগতি')

এখানে চিহ্নিত পর্বগুলোকে মাত্রাবৃত্তে না-প'ড়ে উপায় নেই, যদিও অন্য পর্বগুলি স্বরবৃত্তের। ৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'দিঘি' নামক ছোটো ও সুন্দর কবিতাটিতে, আমার বিবেচনায়, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও পঞ্চমাত্রিক, এই তিন রকম ছন্দ স্থান পেয়েছে ; প্রথম পংক্তি—'যেখানে সে ডুবে আছে' পয়ার ও স্বরবৃত্তের মধ্যে দোদুল্যমান। পয়ারের মধ্যে বি-ষম পংক্তির সুষ্ঠুতা বিষয়ে আমি সন্দেহমুক্ত হ'তে পারছি না, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন 'পারাপারে'র 'বৈদান্তিক' কবিতায়) এই মিশ্রণের ফল উপাদেয় হয়েছে, সতর্কভাবে এ-পথে পরীক্ষা করতে থাকলে বাংলায় মুক্ত ছন্দ বা মিশ্র ছন্দের একটি প্রকরণ গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। এই সম্ভাবনাকে যাঁরা অস্বীকার করেন, যাঁরা বলতে চান এগুলো নিয়মিত ছন্দেরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের কথা আমি বুঝতে পারি না।

দুটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

দুই ছন্দে

অদর্শনের দুঃখ তুমি তাঁকেও তো দাও
যিনি সবই দৃষ্টি করেন—
গাছের ছায়ায় মাঠের কাজে আঙিনাতে
নানান খাতে
বাড়ন্ত দিন অমনি বহাও,
আলোর তলে তাঁকে কি চাও
ব্যথায় যিনি সৃষ্টি করেন।
সংসারিনী, তোমার জন্যে বসুন্ধরা
কল্যাণধন ধান্যে ভরা ;
তবুও বুকের সর্বহারা প্রাণপসরা
হাতে ধ'রে ঊর্ধ্বে তাকাও,—
তিনিই কৃপাবৃষ্টি করেন ॥

জন্মমৃত্যু পথে তোমার সঙ্গী যারা
পরম প্রাণের অঙ্গী যারা
তাদের মিলন পূর্ণ ক'রেও তৃষায় দহি'
তোমায় খোঁজে কোন বিরহী।
পথিক আমি তাঁরি বাঁশি বাজাই দূরে,
দরজা খুলে ভর দুপুরে
আনমনিয়ে নীলাম্বরের স্পর্শসুধায়
কান্না-হাওয়া তোমার হৃদয় ছুঁয়ে কি যায়।

প্রবাসকুসুম ফোটে ঝরে, সমুদ্র ঢেউ ভঙ্গিধারা
ঘরে তোমার আসুক না দোল
অনন্ত রোল,
সূর্যচন্দ্র তোমাকে চায়, তাঁরই অনুরঙ্গী তারা ॥

মৃত্যু

অন্তে দেখে দরজা খোলা—
এক দিকে নীল
জ্যোতির শূন্য মাটির থালায়,
আকাশে চিল ;
অন্যদিকে
গাছ উঠেছে, নদীতে ঢেউ তোলা—
মরবে কোথায় ? এই নিরালায়
অবাধ বুকের শহর ঘাটে
সবাই হাঁটে—

পারে গিয়ে মন ঠেকে যায় মনে—
দেহটার এই চেতনদণ্ড ভাঙলে তবু
অশেষ চেতন
কানায়-কানায় ছড়ায় কোণে-কোণে—
জন্মমরণ
ছিন্ন কোথায় কভু ?

চেনা স্বরে
হঠাৎ শোনে সংসারে কে রেখেছে ডাক,
"বিদায় ভোলো,
এই তো আছি ঘরে—"

দুই গালে হাত দিয়ে ভাবে এ কী অবাক।
—তার পরে তার মৃত্যু হোলো॥

আটচল্লিশের শীতের জন্য

বুদ্ধদেব বসু

(১)

না, তুই নিবি না আর। শূন্য ছেনে হৃদয় ভরাবি।
হাঁ খোলে পাতালবেশ্যা, নেমে আসে কুমারী নীলিমা।
সেখানে ফোটে না ফুল, ম'রে যায় কীটের কালিমা।
যা বলে বলুক ঋতু, তুই শুধু পার হ'য়ে যাবি।

—'কিন্তু কোনখানে?' হায়, সনাতন, শীর্ণ কৌতূহল!
বোঝে না, অনবরত অবসানে আরম্ভ গতির,
স্নান, যান, ধানখেতে কিছু এসে যায় না নদীর,
সাগর করে না প্রশ্ন—'কোন বার্তা নিয়ে এলি, বল!'

ভুলে যা ঝংকার, ঝর্না, বরদাত্রী কঙ্কাবতীরে,
যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই;—
ওরে সেই বরফ-গলানো রঙ্গ আর যদি না থাকে কিছুই,

তবু ছাখ, প্রবল প্রেতের মতো দলে-দলে নামে দুই তীরে
অতীত, আসন্ন কাল; সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি—
যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবরযুবতী।

(২)

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে;
ওরা তোরে কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ;
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস;
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।

প্রাঙ্গণে কিছুই নেই; পারিস তো বধির হ'য়ে যা।
যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন মুনি?
বরং তুলে নে ঘাড়ে আদিবাসী সিনবাদের বোঝা,
ক-টি মাত্র মিল খুঁজে সারাদিন গাধার খাটুনি।

শীতের নোঙর পড়ে ; আর কিসে তোর প্রয়োজন ?
তীর, দ্বীপ, সিন্ধু নিয়ে জেগে ওঠে অমল দেয়াল ;
এক হ'য়ে মিশে যায় ঘণ্টা, বেলা, পরিবর্তন ;

রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার তালি-মারা রঙিন খেয়াল
অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে স'রে যায় নিখিল পৃথিবী,
কেননা, গতির পারে, তারে তুই সৃষ্টি ক'রে নিবি।

(৩)

কবে সেই তুফান ফুরালো—
তবু কেন কাঁপন থামে না !
অন্তরালে উৎকীর্ণ কামনা
শূন্যে ছুঁড়ে বৈদ্যুতিক ধুলো

অন্ধকারে জ্বালায় যন্ত্রণা।
এই সব অস্থির অক্ষর
লুপ্ত ক'রে, কঠিন, সুন্দর,
এসো পূর্ণস্বাধীন সান্ত্বনা,

হৃদয়ের মধ্যে বাঁধো ঘর :
অবরোধ, বরফ, কুয়াশা,
স্তব্ধ মন, শব্দহীন ভাষা,

অগ্নিকুণ্ড, দীর্ঘ অবসর ;—
আর দুই মুগ্ধ অন্তর্যামী—
আমি—আর মুখোমুখি আমি !

সমালোচনা

কৃষ্ণচূড়া, মণীন্দ্র রায়। দীপংকর প্রকাশনী। দেড় টাকা।
যখন যন্ত্রণা, রাম বসু। হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স। দেড় টাকা।

পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অসাম্য ; দেশবিদেশের 'জঙ্গী' মানুষ সেই অসাম্যকে দূর ক'রে, শোষিতের মুক্তি নিয়ে, সুখশান্তি-সচ্ছলতার সোনার দিন শীঘ্রই ফিরিয়ে আনছে—এই কথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখার মধ্যে প্রকাশ করতে পারলে সে লেখা 'প্রগতি'সম্মত হয়। মণীন্দ্র রায়ের 'কৃষ্ণচূড়া' আর রাম বসুর 'যখন যন্ত্রণা' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে এই প্রগতির দৃষ্টান্ত দেখা গেল। কবিদের শ্রেণীগত পরিচয় কিংবা কবিতার বিষয়বস্তু একটা যে খুব জরুরি প্রশ্ন, কবিতার দোষগুণ যার উপর নির্ভর করছে, এমন কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আমরা কবিতা পড়ি তার বিষয়টা খুব সারবান বলে নয়, প'ড়ে কোনো 'উপকার' হবে ব'লেও নয়, ভালো লাগে ব'লে। কবিরাও বোধ করি কোনো কর্তব্যের তাড়নায় লেখেন না, আনন্দ পান ব'লেই লেখেন। কাজেই প্রগতির কবিতাও কবিতা হিসেবেই আমাদের মনে পৌঁছবে আশা করলে অন্যায় হবে না।

ধরা যাক, পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা-দুর্দশা কোনো-কোনো কবির আর সহ্য হচ্ছে না। এবং এ-অবস্থায় অসামাজিক, নীতিনিরপেক্ষ কোনো স্বর গলায় আনাকে তাঁরা যে শুধু অবাস্তব মনে করছেন তা নয়, বলছেন অন্যায়। ধরা যাক, তাঁরা স্থির করলেন—এ-দুরবস্থার একটা আশু প্রতিকার করা আবশ্যক, এবং কবিতা লেখাই যখন তাঁদের কাজ, তাঁরা স্থির করলেন শুধু এই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেই খানিকটা অন্তত বিহিত হ'তে পারে। কবিতার ঝাড়ফুঁক ক'রে পৃথিবীকে নিরাময় করবার ইচ্ছার মধ্যে কতটা পরিমাণে যুক্তি আছে সে-কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রতিকারযোগ্য লাঞ্ছনা বেদনার বিষয়ে মানুষকে কবিতা লিখে অবহিত করানোর প্রয়োজন আছে কিনা, অথবা এ-বিষয়ে যারা উদাসীন (ধরা যাক

তেমন লোকও কবিতা পড়ে) কবিতা ক'রে বললেই তাদের পক্ষে নিজেদের ধিক্কৃত মনে করার সম্ভাবনা কতটা—সে-প্রসঙ্গও না হয় মুলতুবি রাখা গেল। যথার্থই পৃথিবীর দুঃখবেদনাকে কেউ যদি মনের মধ্যে বোধ ক'রে থাকেন, এমন যদি হয় যে সেই চিন্তাই একমাত্র হয়ে তাঁদের প্রাণে দিবারাত্র হানা দিচ্ছে, দশদিকে তাঁরা শোষণ, বিলাপ, আর্তনাদ আর শয়তানের লীলাখেলার প্রতিবিম্বই শুধু দেখছেন, তাহলে সে-বিষয় নিয়ে কবিতা লেখাই তো স্বাভাবিক। এমনকি, কবিতাকে তাঁরা যদি দুর্গতিমোচনের আয়ুধে পরিণত করতে ইচ্ছা করেন, আয়ুধ মাত্রেরই আয়ুষ্কাল হ্রস্ব জেনেও, তাতেই বা কী বলবার আছে? যে-উদ্দেশ্যে করা সেটি সফল হলেই হ'লো। এবং তার আগে কবিতা হলেই হ'লো।

মণীন্দ্র রায় অভিজ্ঞ কবি। প্রথম থেকেই তাঁর লেখায় ছন্দমিলের পারদর্শিতা তরুণ কবিদের ঈর্ষা করবার যোগ্য। এবং কবিতার ভাষাকেও তিনি ভালোবেসেই প্রয়োগ করেন। তৎসত্ত্বেও 'কৃষ্ণচূড়া'য় তিনি ভাবালুতা আর উচ্ছ্বাসের খাদ থেকে রচনাকে রক্ষা করতে পারেননি, যদিও পূর্বেকার চাইতে ছন্দমিল এখানে আরো পাকা হাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতার পর কবিতায় শেষ পর্যন্ত বলবার কথা যেন একটি—পাপিষ্ঠদের অনাচার অত্যাচারে এ-জীবন দুর্বিষহ ; কবে, হায়, সুদিনের সোনার হরিণ এসে পৌঁছবে। গোড়াতেই ব'লে দেওয়া যায় এ-ধরনের যে-কোনো কবিতার শেষ কোথায়। এবং যে-সব চিত্রকল্পের সাহায্যে ইচ্ছাপূরণের এই কল্পনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আনুপূর্বিক কোনো সামঞ্জস্য থাকেনি। বিকেলের কলকাতা, 'হলুদলাগা আঁচলে' এখনো গৃহকাজের ছাপ, কালো মেয়েটি :

> সে যেন এক জানালা-ধরে-দাঁড়ানো কালো মেয়ে
> ক্লান্ত চোখে পথের দিকে রয়েছে একা চেয়ে।
>
> (পূর্বরাগ)

কবে তার প্রেমিকেরা বিপ্লবের জয়বার্তা নিয়ে ঘরে ফিরবে। ছবিটি সুন্দর। এবং কবিতাটি বস্তুত এখানেই শেষ। কিন্তু বলবার কথাটাকে আরও

বিশদ করতে গিয়ে এ-ছবিটিও লেপেপুঁছে তিনি একাকার ক'রে দিলেন। যোগ করলেন :

> আপনজনা ফিরবে ঘরে, সেই আশাতে বধূ
> দু'চোখে তুমি ছড়াবে কবে আগুনরঙা মধু!

দুচোখে ছড়াবে? মধু? অনিশ্চিতগতি তরুণ কবির লেখাতেও অসহ্য লাগতো। তারপর, এই জানালা-ধরে-দাঁড়ানো কালো মেয়েকে দিয়ে 'বজ্র' হানবার সংকল্প তো একেবারেই অচল। অন্যত্র, জীবনের গৃহলক্ষ্মী রূপে এঁকেছেন, শত বিপর্যয় পার হয়ে যে আবার গ্রামের ইঁদারা থেকে জল তোলে, জঙ্গলে কাঠ কুড়োয়। এ-কবিতা আরো কিছু বলার অপেক্ষা রাখে কি? 'তবু তারা মানুষেরই মতো' কবিতায় যাদের কথা বলা হয়েছে, সরীসৃপের মতো জান্তব অস্তিত্ব নিয়ে টিঁকে আছে যারা, তারা কি সত্যি জানে

> নিয়ন আলোর ঘর, লালনীল শাড়ী, স্বাস্থ্য
> গানের জলসা ও কাব্য লুঠ করে তবু

'প্রাসাদ পাষাণপুরী এ মহানগর' স্বস্তিহীন? জানে

> অতীত বদলেছে বর্তমানে, বর্তমান বাড়িয়েছে পা
> দুঃসহ সুন্দর ভবিষ্যতে?
>
> (তবু তারা মানুষেরই মতো)

এই ধরনের রচনার নাম কি কবিতা দেবো? বক্তব্যটা যখন জরুরি, বলার মধ্যে অত্যুক্তির দৈন্য না-থাকাই তখন বাঞ্ছনীয়। ফাঁদে-পড়া বাঘ কি শুধু হতবল শোষকেরই প্রতীক? এবং 'অবিমৃষ্যকারী' সূর্যের সঙ্গেও সেই শোষকের সমীকরণ সম্ভব?

আমি মনে করি, এ-সব অত্যুক্তি এবং অসংলগ্নতার জন্য দায়ী তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে 'সমাজচেতনা'র দ্বন্দ্ব। এবং যেখানেই তিনি কর্তব্যের শাসনকে অবহেলা করতে পেরেছেন, যেমন 'ভোরের স্বপ্ন', 'ঘরোয়া' কিংবা

'অসম্পূর্ণ' কবিতায়—সেখানেই অকুণ্ঠিতভাবে বেরিয়ে এসেছে তাঁর শিল্পীস্বরূপ।

দেখ তমস্বিনী মেলেছে চোখ
হেমকান্তি ঐ মেঘসমাজে।
আজ সূর্যোদয় মধুর হোক,
জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে।

(ভোরের স্বপ্ন)

এ-কবিতার মধ্যে প্রয়াস নেই, শিক্ষণীয় বিষয়ের গায়ে-পড়া ভাব নেই, কবিতাই আছে, যার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু প্রগতির ভার এখানে আশ্চর্য রকমের হাল্কা।

রাম বসুর কবিতায় অবশ্য এই দ্বন্দ্ব এতদূর স্পষ্ট নয়। মানুষের দুঃখদুর্দশায় তিনি এতই বিচলিত যে সে-কথা ব'লে ফেলবার জন্য কবিতার প্রতি মায়ামমতা দেখাতে তিনি অনিচ্ছুক। ফলে তাঁর কবিতায় দুর্গতির তথ্য অনেক আছে, যা থেকে সাংবাদিক বর্ণনাকে পৃথক করা মুস্কিল।

শিয়ালদা ষ্টেশনে
....
আলো জ্বলে সারাক্ষণ
লম্পটের দৃষ্টির মতন
দূরের ইঞ্জিন সিটি মারে

(রেখা ও ছবি)

এই রকম আকস্মিক দুচারটি সার্থক পংক্তির জন্য তিন পাতা জোড়া দুর্গতির তালিকা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অভিজ্ঞতাকে অবিশ্বাস করার কথা উঠছে না, কথা হচ্ছে কবিতাকে দিয়ে সে উপলব্ধিকে তিনি আমাদের মনেও সৃষ্টি করাতে পেরেছেন কিনা। 'যখন যন্ত্রণা'র কবিতাগুলিতে পারেননি। কেননা শেখানো বুলির মতো কথাগুলোকে আউড়ে দিয়েই এ-কবিতা চুপ ক'রে যায়, রেশ

থাকে না। যেমন, বুকের পাঁজরা খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সিংভূমের বেদনা নিচের পংক্তিগুলোতে একতিল ধরা পড়েছে কি?

তার কোলে হত্যা, তার কোলে কান্না
বেনের সভ্যতা চতুর লম্পট
আদিবাসীর জীবনে পারার বিষ
যমরাজ দারোগা পুলিশ
সাহেব বাবুর প্রণয়িনীর গর্ভপাত
শেঠ, টাটা, বার্ড, বার্ন, আই. সি. সি;
অপমানিতা সিংভূম বধূ-বরণ গোধূলিতে অচৈতন্য।

(সিংভূম)

এ-জিনিস না-কবিতা, না-পদ্য, এমনকি গদ্যও না। গদ্যেও আরো গুছিয়ে ভালো ক'রে বলা যেতো। তাঁর উপমার মধ্যে স্থানে স্থানে বৈচিত্র্য আছে ('বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো' গ্রাম, 'বাইশ বছরের নারীর মতো উন্মুখ' প্রকৃতি)। এবং চেষ্টা করলে

আমার সেই পাখী শাখায় দোল খায়
শিকড়ে ঢেউ ওঠে পাথর ভেঙে ছোটে
ক্ষিপ্র বেগ তার পাতালে মাথা কোটে
ধসায় মাটি তারা হৃদয় ভেঙে যায়
শাখায় সেই পাখী যখন দোল খায়

(উৎসর্গ)

এরকম অনুরণনে ভরা সুষ্ঠু সুন্দর কবিতাও যখন লিখতে পারেন, তখন কি ভেবে দেশপ্রেম মানবপ্রেমের কথা বক্তৃতার মতো শাদা কথায় তিনি ঘোষণা করতে গেছেন জানি না।

ছন্দের পরীক্ষা নিয়েও রাম বসুর কৌতূহল আছে। তবে 'রক্তাক্ত বাঘিনী' এবং 'যখন যন্ত্রণা' নামের সনেট দুটি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে পয়ার বিশ মাত্রায় দাঁড়াতে পারে না। বাচ্যার্থের অনুসরণ ক'রে গদ্যের মতো পড়ার চেষ্টা করলেও শেষ পংক্তিতে গিয়ে ২০ মাত্রার পয়ার আছড়ে পড়ে:

সে বাঘিনী এ জীবন প্রতিশোধে অন্ধ, মত্ত থাবা তুলে।

হয় দুমাত্রা কম, নয়তো বেশি চাই এখানে, মনে হয়।

রাম বসু শুধুই যে প্রগতির কবিতা লেখেন তা নয়। এবং যে-সব কবিতার জন্ম কবির মনের মধ্যে, যার প্রধান উদ্দেশ্য এই নয় যে তা থেকে অন্যের মনে সমবেদনা, দয়া, ক্রোধ কিংবা হিংসা জাগবে, লেখার তাগিদেই যা লেখা, যেমন 'অধিকৃত' কিংবা 'কান্না', 'সে' কিংবা 'সেই মুখ', কবি হিসেবে, আমার মনে হয়, সেইখানেই তিনি সফল হতে পেরেছেন। গত শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী যাদের অজানা, কানু, সিধুর উল্লেখ না বুঝলেও, 'অধিকৃত' কবিতাটি তাঁদের মনে ঠিক পৌঁছবে। এর মধ্যে বক্তৃতা নেই, বেদনা আছে, ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে মিলে পংক্তিগুলি তাই শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না :

সুতানটির গাঙে দিলে মন পবন নাও ওরে
ভালোবাসার গান ওরে ভাঙা গড়ার বান ওরে
রূপকথার গান।

এই নিয়েই 'কাব্যের ফরমাস'। সে-সুর ভিড়ে হারিয়ে যায় না, চিনে নেওয়া যায়।

প্রগতির কবিতার গুণ তাহলে কি এই যে তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলে, বক্তৃতা করাও চলে, কিন্তু কবিতা হিসেবে তার রেশ কারো মনে পৌঁছয় না? এবং তার কারণ কি এই নয় যে বক্তব্যটা এসব কবিতায় সম্পূর্ণ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া? এসব কবিতার মধ্যে দয়ার, করুণার পরিচয় আছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ আছে, মহৎ অভিপ্রায়ের বিবৃতিও আছে। সেই সঙ্গে আছে অপরিমিত উচ্ছ্বাস, অসংযত আত্মকরুণা, এবং কবিতার কারুকর্মের প্রতি, কোথাও কোথাও সচেতনভাবেই, অবজ্ঞা আর উদাসীনতা। কবির মন বাইরের দিকেই অপলক দৃষ্টিতে আবদ্ধ থাকলে যা হয়। একদিকে শিল্পীর স্বভাব, অন্যদিকে তাঁর সামাজিক দায়িত্বের চেতনা—দুয়ের বিরোধে প'ড়ে প্রগতির কবিতা শিথিল ভাবালুতায় পর্যবসিত। পৃথিবী শিগগির ভালো হয়ে গেলে দেশোদ্ধার এবং সমাজ-সংস্কারের দায় থেকে কবিরা হয়তো মুক্তি পেতেন এবং তখনো লিখতে হলে যা লিখতে হোতো তার মধ্যে কবিতা না-হওয়ার কোনো ওজুহাত থাকতো না।

নরেশ গুহ

The Flowers of Evil, Charles Baudelaire. Selected & Edited by Marthiel and Jackson Mathews. New Directions, $ 6. 00.

100 Poems from the Japanese, Kenneth Rexroth. New Directions, $ 3. 50.

(কলকাতার রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানিতে প্রাপ্য)

ফরাশি কবিদের মধ্যে বোদলেয়ার-এর বৈদেশিক প্রতিপত্তি সর্বাধিক; অনুবাদকের পক্ষেও তাঁর আকর্ষণ প্রবলতম। তার কারণ, তাঁর কবি-মানস সম্পূর্ণ আধুনিক হ'লেও (বস্তুত, তাঁকেই আধুনিক কাব্যের আদি উৎস বলা যায়) তাঁর রচনারীতি প্রাঞ্জল; তাঁর পরবর্তী এবং শিষ্যপ্রতিম কবিরা, মালার্মে, ভালেরি, রিলকে, এলিয়ট, এঁদের রচনার অনিবার্য দুরূহতা তাঁর কোনো-একটি পংক্তিতেও খুঁজে পাওয়া যায় না; 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রত্যেকটি কবিতা প্রসাদগুণে নির্মল ব'লে অদীক্ষিত পাঠকের পক্ষেও তিনি সহজে অধিগম্য। অনুবাদকের পক্ষে তাঁর আকর্ষণের কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে একটি স্পর্শসহ সংবাদের উপস্থিতি; জিনিশটাকে যেন ধরা ছোঁয়া যায়, বিষয়টা প্রায় কাহিনীর মতো উল্লেখসাপেক্ষ, এবং যে-সব চিত্রকল্পের দ্বারা তা প্রকাশিত হয় সেগুলো সব সভ্য ভাষাতেই তুল্যমূল্য। অর্থাৎ তাঁর কবিতার অভিজ্ঞতা শুধু শব্দবিন্যাস বা ধ্বনির মায়াজালের উপর নির্ভর করে না, এবং তাঁর চিন্তার ভাষাই ছবি ব'লে ভাষান্তরে অভিপ্রায়বিকৃতির আশঙ্কা খুব ক'মে যায়। নির্বস্তুক শব্দগুলোর এক-এক ভাষায় এক-এক রকম ইঙ্গিত; কিন্তু সামান্য বিশেষ্য শব্দের অবিকল অনুবাদ সম্ভব; 'bird', 'oiseau' এবং 'পাখি' অদ্ব্যর্থভাবে একই জিনিশকে বোঝাচ্ছে; কিন্তু 'esprit' কথাটাকে বাংলায় (বা ইংরেজিতে) বোঝাতে হ'লে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হ'তে পারে। বোদলেয়ারের কবিতার প্রধান নির্ভর মূর্ত বা দৃশ্য শব্দ; তাই সক্ষম অনুবাদের মধ্যে তিনি বহুলাংশেই প্রবেশ ক'রে থাকেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, কবির মৃত্যুর দু-বছর আর 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' প্রথম প্রকাশের বারো বছর পরে, ইংরেজি ভাষায় বোদলেয়ারের অনুবাদ-কর্ম আরম্ভ হয়।

সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়, সেই অনুবাদের পরিমাণ অনবচ্ছিন্নভাবে বেড়ে চলেছে; দক্ষিণ আফ্রিকার কবি রয় ক্যাম্বেল কিছুদিন আগে সম্পূর্ণ 'ফ্লার দ্য মাল' ইংরেজিতে প্রকাশ করেছেন। নিউ ডিরেকশন্স প্রকাশিত গ্রন্থটি এই পর্যায়ে সর্বশেষ ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সংযোজনা। মূল 'ফ্লার দ্য মাল'-এর বিভিন্ন সংস্করণের অন্তর্গত ১৬৩টি কবিতার প্রত্যেকটি এখানে স্থান পেয়েছে; প্রত্যেকটি কবিতার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন ইংরেজি পাঠ তুলনা ক'রে, সম্পাদকেরা উত্তমটিকে বেছে নিয়েছেন। ভূমিকায় তাঁরা জানিয়েছেন যে কোনো-কোনো কবিতার কুড়িটি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুবাদ তাঁদের হাতে এসেছে; এবং কয়েকজন মার্কিন কবি এই গ্রন্থেরই জন্য বিশেষ-ভাবে কয়েকটি অনুবাদ রচনা ক'রে দিয়েছেন। অনুবাদকের মোট সংখ্যা ৩০; তাঁদের মধ্যে আছেন স্টার্জ মূর, স্যর জন স্কোয়ার, মাইকেল ফীল্ড, জেমস এলরয় ফ্লেকার, অল্ডস হাক্সলি, এডনা সেণ্ট ভিনসেণ্ট মিলে, অ্যালেন টেইট, রিচার্ড উইলব্যর এবং কার্ল শেপিরো-র মতো বিভিন্ন সময়ের নামজাদা ইংরেজ ও মার্কিন লেখক; সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আছেন রয় ক্যাম্বেল; ডেভিড পল, সি. এফ. ম্যাকিন্টর আর অ্যালন কণ্ডর-এর অনুবাদও সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখ্য। কিন্তু, অনুবাদক যিনিই হোন, ইংরেজিতে প্রত্যেক কবিতাই সুখপাঠ্য ও ফলপ্রসূ, একই লেখকের একটি অখণ্ড গ্রন্থের মতো বইটিকে পাঠ করা যায়।

'The Flowers of Evil'-এ মূল ফরাশি পাঠও সংযোজিত হয়েছে, (রয় ক্যাম্বেলে তা নেই); মুখোমুখি পৃষ্ঠায় নয়, বইয়ের শেষ অংশে স্বতন্ত্র-ভাবে উদ্ধৃত। 'ফ্লার দ্য মাল'-এর একটি সংস্করণে বোদলেয়ার লংফেলোর 'The Song of Hiawatha'-র আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন; সেই অনুবাদ, এবং ইংরেজিতে তার পুনরনুবাদ স্থান পেয়েছে ব'লে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণতায় কোনো খুঁত নেই। (বোদলেয়ার-কৃত পো-র অনুবাদ 'ফ্লার দ্য মাল'এর অন্তর্গত হয়নি ব'লে এই গ্রন্থ থেকে বর্জিত হ'লো, এতে একটু আক্ষেপ হয় আমাদের; সেই অনুবাদ থেকে আবার

যদি কেউ ইংরেজি করতেন, তাহলে শুধু কৌতূহল তৃপ্ত হ'তো তা নয়, অনুবাদের প্রকরণেও মূল্যবান আলোক-পাত হ'তো।) গ্রন্থের 'Further Poems' অংশের ২৭, ২৮ ও ২৯ নম্বর কবিতা রয় ক্যাম্বেলে নেই; 'ফ্লার দ্য মাল'-এর উৎসর্গপত্র (To the impeccable poet, Theophile Gautier), এবং ফরাশিতে অপ্রকাশিত তিনটি ভূমিকার খশড়া—এ-সব সংযোজনেও আলোচ্য গ্রন্থটি অধিক আদরণীয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, একটিমাত্র গ্রন্থের মধ্যে কবি বোদলেয়ারকে সম্পূর্ণভাবে পেতে হ'লে ইংরেজি ভাষার পাঠকের পক্ষে 'The Flowers of Evil' অপরিহার্য। এবং এই অতুলনীয় কাব্যের প্রথম প্রকাশের শতবার্ষিকী যখন আসন্ন, তখন এই গ্রন্থের প্রকাশ বিশ্ব-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাংলায় আমরা চীনে কবিতার সঙ্গে যতটা পরিচিত, জাপানির সঙ্গে তার অর্ধেকও নই; অবশ্য আথার ওয়ালে আমরা অনেকেই পড়েছি, এক সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু অনুবাদও করেছিলেন; কিন্তু গত পনেরো বছরের মধ্যে যেখানে অতত পঞ্চাশটি চীনে কবিতার বাংলা অনুবাদ হয়েছে সেখানে জাপানি কবিতা একটিরও হয়নি। শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের অস্তিত্ব এর একটি গৌণ কারণ মাত্র (কেননা ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর-কোনো অনুবাদক আমরা পাইনি); আসল কারণ বোধহয় চৈনিক কবিতার ব্যাপকতর আবেদন, এবং সাধারণভাবে আমাদের মনে এই ধারণা যে জাপানি সংস্কৃতি চৈনিকেরই একটি সম্প্রসারণ। এ-কথা সত্য যে লিপি, শিল্পকলা, Zen বৌদ্ধধর্ম—সবই চীন থেকে কোরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপানে পৌঁচেছিলো; কিন্তু তাই ব'লে জাপানকে চীনেরই একটি শাখা ব'লে ভাবলেও ভুল হবে; কাব্যের ক্ষেত্রে তার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিপাতমাত্রেই বোঝা যায়। জাপানি প্রতিভা বিশেষভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে ছোটো কবিতায়—পাঁচ লাইনের তানকা বা তার চেয়েও ছোটো হাইকুতে—যার অনুরূপ রচনা পৃথিবীতে আর কোথাও আমরা পাবো না—না ল্যাটিন এপিগ্রামে, না সংস্কৃত

উদ্ভট কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'য় বা ডি. এইচ. লরেন্সের 'প্যানজি্জ্-এ এবং এই বিশেষ ধরনের কবিতার একটি ছোটো, সুন্দর, ব্যবহার্য সংগ্রহ কেনেথ রেক্সরথ-এর '100 Poems from the Japanese'।

রেক্সরথ হাল আমলের নামজাদা মার্কিন কবি; তাঁর নিবাস সান ফ্রানসিস্কো, যার উপকূলে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে জাপানকে অনুমান করা যায়, যার 'চায়না টাউন' পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জমকালো, এবং যে-নগর বিবিধ এশীয় বিদ্যার একটি কেন্দ্রস্থল ব'লে পরিগণিত। রেক্সরথ খুব তরুণ বয়সেই জাপানি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন; বহু বছরের অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থের শতাধিক কবিতায় একত্রিত হয়েছে। ভূমিকায় জাপানি কবিতাকে তিনি বলেছেন 'poetry of sensibility'; —কথাটা ঠিক, কিন্তু 'sensibility' মানে যদি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয় তাহ'লে অন্যান্য দেশের অন্যান্য ধরনের কবিতার মধ্যেও তার কমিষ্ঠতা কম নয়, জীবনানন্দ দাশকেও 'sensibility'র কবি বললে ভুল হয় না। 'প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক?' বা 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা'—এ-সব পংক্তি ঈষৎ বদলে, ছোটো-ছোটো চার-পাঁচটি পংক্তিতে সাজালে, জাপানি ব'লে চালানো অসম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, ইয়াকামোচির 'The wind rustles the bamboos/By my windows/In the dusk' বা হিতোমারোর 'I sit at home/In our room/By our bed/Gazing at your pillow'—এই ধরনের রচনাকে আমাদের অভ্যস্ত ভারতীয় বা ইওরোপীয় কবিতার একটি মাত্র পংক্তি ব'লে, বা নাটকীয় উক্তির একটি অংশ ব'লে, মনে হ'তে পারে—যদিও জাপানি মতে এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। অত্যন্ত বেশি বলা যেমন ভালো নয়, তেমনি অত্যন্ত কম বলার দিকে ঝুঁকলেও একদিকে যেমন সূক্ষ্মতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তেমনি অন্য দিকে কবিতা লেখাটা একটা পরিশীলিত ক্রীড়ায় অধঃপতিত হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু সুখের বিষয়, রেক্সরথ প্রাচীন জাপানি কাব্য থেকে (তাঁর কবিদের জীবৎকাল আট থেকে দশ শতক) যে-সংকলন

করেছেন, তার মধ্যে একেবারে অ-কবিতা একটিও নেই, এবং অধিকাংশই আশ্চর্যভাবে সেই গুণের অধিকারী, যাকে সংস্কৃতে বলেছে 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য'। তাঁর টীকার সাহায্যে আমরা আরো জানতে পারি যে অনেক কবিতায় একাধিক অর্থ নিহিত আছে; আর তার ফলে যদিও কবিতা পড়ার সঙ্গে হেঁয়ালি-সমাধানের পার্থক্য ঘুচে যাবার ভয় থাকে, তবু সাংকেতিক ভাষার ব্যবহারে জাপানি কবির নৈপুণ্যকে শ্রদ্ধা না-ক'রেও উপায় থাকে না। 'Though the purity/Of the moonlight has silenced/Both nightingale and/Cricket, the cuckoo alone/Sings all the white night.' —এই কবিতায় ব্যঙ্গ্যার্থ হ'লো :—'বুদ্ধের মন্ত্রে গৃহী আর সন্ন্যাসী দু-জনেই মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু, তার নিজের ধরনে, বেঙ্গা সারা রাত ধ'রে পূজা ক'রে চলেছে।' অর্থাৎ, উপমা জিনিশটাকে বধ করা হ'লো; 'যেমন' বা 'মতো' শব্দের উচ্ছেদ ক'রে কবি উপমানের উল্লেখ ক'রেই ছুটি নিলেন। (এইজন্যেই ইমেজিস্টরা একটি ব্যবহার্য আদর্শ পেয়েছিলেন জাপানি কবিতায়, তার প্রভাব ইয়েটস-এর উপরেও আড় হ'য়ে পড়েছিলো।) আকাহিতোর : 'আগামী কাল আমার যাবার কথা/বসন্তের প্রান্তরে ফুল কুড়োতে/গত কাল সারাদিন ধ'রে বরফ পড়লো। আজ বরফ পড়লো সারাদিন ধ'রে'—এর মানে—কোনো তরুণীর সঙ্গে প্রণয়ব্যাপারের মধ্যিখানে হঠাৎ আপন বাধ ক্যের উপলব্ধি। হিতোমারোর 'My girl is waiting for me/And does not know/That my body will stay here/On the rocks of Mount Kamo'—এখানে 'my girl' মানে মৃত্যু। এই দুই-অর্থ জাপানি কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু সব কবিতাই এই লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত নয়; অনেক কবিতা সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর, উল্লেখের প্রত্যাশাবর্জিত, এবং অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যেই রীতিমতো সমাপ্ত। অনেক বেশি উদ্ধৃতি দেবার জায়গা নেই আমাদের, কিন্তু সম্রাজ্ঞী ইয়ামাতোহিমের 'Others may forget you, but not I/I am haunted by your beauiful ghost' কিংবা তোশিয়ুকির 'Autumn has come invisibly/Only the wind's voice is ominous'—

এখানে বক্তব্য বোঝার জন্য নোট দেখতে হয় না, কিন্তু বাচ্যার্থের চাইতে কিছুটা বেশি বলা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অংশে স্থান পেয়েছে কয়েকটি হাইকু (অধিকাংশই বাংলায় পরিচিত), আর হিতোমারোর তিনটি দীর্ঘ (জাপানি মাপে দীর্ঘ) নাগা উতা জাতীয় কবিতা ; তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তৃতীয় কবিতাটির সঙ্গে চীনে কবি য়ুয়ান চন্-এর 'An Elegy'-র (কয়েক বছর আগেকার 'কবিতা'য় 'মৃতা পত্নীর প্রতি' নামে অনুবাদ দ্রষ্টব্য) স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে ব'লে মনে হয়। হিতোমারো য়ুয়ান চন্-এর পূর্ববর্তী ; অতএব এ-রকম অনুমান করলে অন্যায় হয় না যে এই একটি ক্ষেত্রে চীনের উপর জাপানি কাব্যের প্রভাব পড়েছিলো। না কি দুটি কবিতারই অন্য কোনো পুরোনো উৎস আছে ?

'100 Poems from the Japanese' অত্যন্ত সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য গ্রন্থ ; লাতিন হরফে মূল জাপানিও মুদ্রিত আছে, এবং সেই সঙ্গে জাপানি লিপি-চিত্র বা ক্যালিগ্রাফির নমুনা। পুস্তকবিলাসী গ্রন্থটি নাড়াচাড়া ক'রেও আনন্দ পাবেন। মার্কিনদেশের সবচেয়ে উদ্যোগী প্রকাশকদের মধ্যে নিউ ডিরেকশন্স অন্যতম, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ-প্রকাশে তাঁরা অক্লান্ত, এবং তাঁদের ভাবী তালিকার মধ্যে একটি চীনে কবিতার সংকলনও তাঁরা ঘোষণা করেছেন। আমরা আশা করবো যে কোনো সময়ে তাঁরা সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার কাব্যেরও অনুবাদ প্রকাশের ভার নেবেন ; দুঃখের বিষয়, কী ইংলণ্ডে কী আমেরিকায়, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে এখনো তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, অনেক সময়ই অর্ধমনস্ক দায়-সারা গোছের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্কের চার্লস স্ক্রিবনার্স সন্স 'A Little Treasury of World Poetry' নামে যে-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে হিব্রু কবিতা ছিলো ৪০ পৃষ্ঠা, চীনেও তা-ই, জাপানি ৩৩, লাতিন ৮৫, গ্রীক প্রায় দেড়শো—আর সংস্কৃত ২৫, তার মধ্যেও আবার চার পৃষ্ঠা হিন্দি ও বাংলা। অথচ পৃথিবীর প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আয়তন সবচেয়ে বিরাট। হ'তে পারে, ভারতীয় ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটাই তো ইংরেজি ভাষার পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের উদাসীনতার প্রমাণ। —বু. ব.

চিঠিপত্র

'কবিতা'র কুড়ি বছর

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্র কুড়ি বছরে পড়লো, এ-কথা মনে হ'তেই আধুনিক বাংলা-কাব্য-আন্দোলনের একটি বিচিত্র অধ্যায় স্মরণে এলো। আর সে-কারণেই এই চিঠি।

১৯৩৫ সাল। সবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ ক'রে কলেজে ঢুকেছি, কলকাতা থেকে আমার এক ছাত্রবন্ধু সদ্যপ্রকাশিত 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাটি পাঠিয়ে দিলেন। ঝরঝরে ছাপা, আকার এখনকার মতোই। তিনটি বড়ো হরফে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে আঁকা প্রচ্ছদ, অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এঁকেছিলেন। আর লেখক ? আমাদের বাড়িতেই দাদার পুরোনো স্টিলের বাক্স থেকে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'র কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা পড়েছিলাম বছর খানেক আগে, দেখলাম 'কবিতা'য় সে-সব পত্রিকার লেখকরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), হেমচন্দ্র বাগচী, অজিত দত্ত ও বিষ্ণু দে। নতুন কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, হুমায়ুন কবির, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (ইনি স্থতিশেখর উপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখতেন), প্রণব রায়। পত্রিকাটি ভালো ক'রে আগাগোড়া দেখে মনে জাগলো অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও উল্লাস। কেননা তার আগাগোড়া কবিতায় ভরা।

মনে পড়ছে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ছিলেন আপনি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক, সমর সেন। অবশ্য কয়েক সংখ্যা বেরুবার পর প্রেমেন্দ্রবাবু আর সম্পাদক থাকেন নি, এবং সমর সেনও কিছুকাল পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। কবিতাভবনে যখনই গিয়েছি পত্রিকাসংক্রান্ত সব কাজ আপনাকেই করতে দেখেছি, অনেক সময় নানা অসুবিধের মধ্যে। 'কবিতা' যে কুড়ি বছরে

পড়লো তার মূলে রয়েছে আপনার সাহিত্যাদর্শের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এ-সত্য কবুল করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যাটি প'ড়ে খুশি হ'য়ে আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন, দ্বিতীয় সংখ্যায় সেই চিঠি প্রথম ছাপা হয়েছিল। সেই সংখ্যাতেই প্রথম কবিতা পেলাম রবীন্দ্রনাথের, আমাদের বিস্ময় তখন সীমা ছাড়িয়ে উঠলো। পত্রিকার তখনকার দাম ছিল ছ' আনা, লেখক ও রচনার অপূর্ব যোগাযোগের তুলনায় তখনকার দিনেও ও-দাম কিছুই নয়।

মনে পড়ছে প্রথম পাঁচ-সাত বছর চলেছিলো 'কবিতা'র স্বর্ণযুগ। প্রতি সংখ্যায় সুপরিচিত শক্তিমান কবিদের সমাবেশ, তাঁদের নতুন-নতুন কবিতা, আর সেই সঙ্গে নবীন কবিদের রচনাগুচ্ছ। ঢাকা শহরের অবজ্ঞাত কোণে ব'সে লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করতুম ; 'কবিতা'র দ্বিতীয় বছরের প্রথম সংখ্যায় আমার ছুটো কবিতা ছাপার অক্ষরে বেরুতেই মনে হ'লো গুণীজনের সভায় আসন পেয়ে গেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিতরেও তখন দেখেছি প্রবল সাহিত্যঘটিত তার্কিক উত্তেজনা ; প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দের কবিতা নিয়ে আলোচনা। সদর ঘাটে নবাব-বাড়ির পিছনে বেশ নিরিবিলিতে জ'মে উঠতো সাহিত্যের সেই সান্ধ্য আড্ডা, রাত দশটার ঘণ্টা শুনে অগত্যা বাড়ি ফিরতে হয়েছে। দ্বিতীয় বছরে এবং পরবর্তী কয়েক বছরে আরো যাঁরা 'কবিতা'য় আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁদের মধ্যে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণীন্দ্র রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র ঘোষের কথা মনে পড়ছে। কাগজটিকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল একটি সুখী পরিবার, পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের সাহায্যে যোগাযোগরক্ষার রীতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, এ-কথা আপনার অজানা নয়।

আয়তনে, আকারে ও কবিতাগুচ্ছের উৎকর্ষে 'কবিতা'র প্রথম কয়েক বছরের ইতিহাস স্মরণীয়। এখন যাঁরা শক্তিমান কবি ব'লে অভিনন্দিত, তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা তো 'কবিতা'তেই প্রথম বেরিয়েছে। বিখ্যাত ও স্মরণীয়

কবিতাবলীর মধ্যে 'নীল দিন', নীলকণ্ঠ' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'মৃত্যুর আগে,' 'বনলতা সেন' (জীবনানন্দ দাশ), 'চেতন ভাকরা' (অমিয় চক্রবর্তী), 'টগ্গা ঠুংরি, 'ক্রেসিডা', (বিষ্ণু দে), 'নরক' 'নান্দীমুখ', 'উপসংহার' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত), 'চিত্তায় সকাল', 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা', 'দময়ন্তী', 'নির্মম যৌবন' (বুদ্ধদেব বসু) এবং সমর সেনের অনেক কবিতারই উল্লেখ করতে হয়। 'কবিতা'র তৃতীয় কি চতুর্থ বছরেই এলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পদাতিক' কবিতাটি বেরুতেই তিনি তরুণ পাঠকসমাজে পরিচিত হলেন। এদিকে নিশিকান্ত আপনাকে কবিতা পাঠালেন পণ্ডিচেরি থেকে ; 'কবিতা'র তৃতীয় বছরে তাঁর 'মহামায়া', 'পণ্ডিচেরির ঈশাণ কোণের প্রান্তর' পাঠে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন অনেকেই।

'কবিতা'র পাশাপাশি আরো একটি সাহিত্যপত্রের নাম অনিবার্যরূপেই মনে পড়ে। আপনি জানেন, যে-সব তরুণ কবি সবেমাত্র 'কবিতা'য় প্রথম লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' মাসিকপত্রেও (গোড়ায় ত্রৈমাসিক) তাঁরা অনেকেই স্থান ক'রে নিয়েছিলেন। 'পরিচয়ে'ই প্রকাশিত হ'লো আমার তৃতীয় কবিতা, একই বছরে এবং সেই সঙ্গে সমকালীন তরুণ কবিবন্ধুদেরও। একই সঙ্গে 'কবিতা' ও 'পরিচয়ে' লেখা তখনকার দিনে যে কী আনন্দের ও তৃপ্তির ব্যাপার ছিলো তা আজকের দিনে উপলব্ধি করা সহজ নয়। ছাত্রজীবনে, ১৯৩৭-৩৯ সালে, কলকাতায় এলে মাঝে-মাঝে যেতাম সুধীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পুতুল-মূর্তিশোভিত হলদে রঙের বাড়িতে। নম্র, ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার। সুধীন্দ্রনাথ নিজে কবি, কাব্যচর্চায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সে-সময়ে তাঁর কাছ থেকে আমি ছাড়াও আরো অনেকেই নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন।

আপনার বন্ধু ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক পরিমল রায়কে মনে পড়লো এই সূত্রে। 'কবিতা'র প্রথম ক'বছর গদ্য-কবিতা লেখার ঢেউ এসেছিলো। গদ্য-কবিতা যে কবিতাই এ-কথার সমর্থনে আপনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কবিতা'য়। পরিমলবাবু কিন্তু ছিলেন গদ্য-কবিতার বিরোধী, এবং আমাকে একদা জানিয়েছিলেন যে গদ্য-কবিতা যে

অনায়াসলভ্য এটা প্রমাণ করবার জন্যেই তিনি লিখবেন 'কবিতা'য়। লিখেওছিলেন দুটি কি তিনটি। কিন্তু ভারি সুন্দর। 'গ্রামোফোন' কবিতাটি মনে পড়ছে। পড়বার পর গদ্য-কবিতার উপর আমাদের বরং শ্রদ্ধাই বেড়ে গিয়েছিলো। সুন্দর ছড়া লিখতেন পরিমল রায়। আপনার চাইতে বেশি কে আর সে-খবর রাখে! 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় 'বঙ্কিমনাথও পদ্য লেখে' কবিতাটি ছড়ার ছন্দে লিখেছিলেন অজিত দত্ত। তার প্রত্যুত্তরে পরিমল রায়ও চমৎকার একটি ছড়া লিখেছিলেন।

শুধু কবিতাই নয়, 'কবিতা'র সমালোচনা-বিভাগও উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এখন মনে পড়ছে যে আপনি নিজে সে-সব আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রে 'কবিতা'র ভিতর দিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যের নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। স্পষ্টবাদিতার জন্যে আড়ালে হয়তো বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হয়েছে, কিন্তু কোনোক্রমেই সমালোচনার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেননি ব'লে নিশ্চয়ই আপনি আজকের কাব্যপাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের অনূদিত ব্রাউনিংএর কবিতার ('ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা') সমালোচনার দরুন তিনি আপনার উপর খুব রেগেছিলেন মনে পড়ছে। অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁর, অজস্র কবিতা লিখতেন স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে। ঢাকা গভর্মেণ্ট কলেজে যখন তিনি অধ্যক্ষ হ'য়ে গিয়েছিলেন তখন আমরা নিতান্তই কিশোর। গম্ভীর মুখ দেখে তাঁকে ভয় করতুম গোড়া থেকেই, কিন্তু ১৯৪২ সালে তাঁর আলিপুরের নিউ রোডের বাড়িতে গিয়ে জেনেছিলাম তিনি আসলে প্রাণখোলা রসিক ও অমায়িক মানুষ।

মাঝে-মাঝে বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে 'কবিতা'র। কয়েকটি সংখ্যা মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলনরূপে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রথম বিশেষ আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সমর সেন, হুমক্রে হাউস, লীলাময় রায় প্রভৃতির মূল্যবান রচনাবলীর উল্লেখ করতে ছয়। এ ছাড়া, বিশেষভাবে স্মরণীয় রবীন্দ্র-সংখ্যাটি। অন্তত

এ দুটো সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হ'লে সাহিত্যপাঠক উপকৃত হবেন ব'লেই আমার ধারণা। কাগজ যখন পাওয়া যায় না, চারদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা সেই সময়ে প্রকাশিত হ'লো নজরুল সংখ্যাটি। বড়ো ক্ষীণ অবয়ব, বড়ো তাড়াহুড়োর ছাপ, তবু উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

'কবিতা'র সাধারণ সংখ্যাতেও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও আলোচনার অভাব ঘটেনি। আপনিই বেশি লিখেছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলীর উপর আপনার আলোচনা ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার সময় বৈশিষ্ট্যের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। এ ছাড়া, আপনার আরো কয়েকটি প্রবন্ধ, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা' 'বর্নার্ড শ : এইচ. জি. ওএলস' 'প্রমথ চৌধুরী' 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' প্রভৃতি মনে পড়ছে। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে কিছুকাল আগে নরেশ গুহর কাব্যগ্রন্থকে উপলক্ষ্য ক'রে অমিয় চক্রবর্তীর মূল্যবান প্রবন্ধ এবং অমলেন্দু বসু, অরুণকুমার সরকার, লোকনাথ ভট্টাচার্য, নরেশ গুহ ও অপর্ণা চক্রবর্তীর গদ্যরচনা আমাদের ভালো লেগেছিলো।

এই দীর্ঘকাল পরে বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে 'কবিতা' পত্রিকার মতো একটি কাগজের অস্তিত্বের প্রয়োজন কেন এত বেশি। এই ত্রৈমাসিক আসলে তরুণ কবিসম্প্রদায়ের আশাভরসার স্থল এবং এখন পর্যন্ত বাংলার নবাগত ও তরুণতর কবিরা সকলেই এসে ভিড়েছেন 'কবিতা'য়। যুদ্ধকালীন সময়টাই ছিলো পত্রিকাটির পক্ষে সাংঘাতিক। কবিরাও অনেকেই তখন ভারসাম্য হারাতে বসেছিলেন। সুখের বিষয়, সে-রকম অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয়নি, তরুণ কবিরা আবার ফিরে পেয়েছিলেন তাঁদের সুস্থ মানসতা। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার, আনন্দ বাগচী, সুনীলচন্দ্র সরকার, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় এই সুস্থ মানসের চিহ্ন দেখে আশ্বস্ত হওয়া চলে। আপনি নিশ্চয় জানেন, ইদানীং কাব্যক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগীদের সংখ্যা আরো বেড়েছে এবং অনিয়মিত হ'লেও আরো তিন-চারটি কবিতার পত্রিকা চলছে।

'কবিতা' সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে অন্য বিচিত্র সাহিত্যিক উদ্যোগেও আপনি

বিরত থাকেন নি। তারই ফলে কবিতাভবন থেকে বহু কাব্যগ্রন্থ এবং 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার প্রকাশ হ'তে পেরেছিলো। এই ষোলো পাতার চার আনা দামের সুমুদ্রিত বইগুলো তখন বেশ লেগেছিল আমাদের। আপনার 'এক পয়সায় একটি', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'উড়কি ধানের মুড়কি' অমিয় চক্রবর্তীর 'মাটির দেয়াল' সমর সেনের 'খোলা চিঠি' ও কামাক্ষীপ্রসাদের 'সোনার কপাট'—এই ক-টি বইয়ের চেহারা চোখের সামনে ভাসছে।

'কবিতা'র এই কুড়ি বছরের জীবনে অনেক নতুন মানুষের সন্ধান পেয়েছি। কবিতা যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কাব্যসাধনার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এঁদের রচনায় ধারাবাহিকতার চিহ্ন আছে এবং এদের নতুন-নতুন কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে। কেউ-কেউ হলেন ক্ষণবসন্তের ক্ষীণ পাখি, একটি কি দুটি রচনায় আশা জাগিয়েই সংসারের অতল গর্ভে তলিয়ে গেলেন। আবার অনেকে বয়ঃসন্ধির অনিবার্য ফাঁড়া কাটিয়ে আর কিছুতেই অগ্রসর হ'তে পারলেন না। এ-রকমই হয়, এই নিয়ম। সাহিত্যিক বাঁচেন তাঁর আজন্মসাধনার ধারাবাহিকতার জন্যে, উড়ে এসে জুড়ে ব'সে দু-চারটি চমকপ্রদ রচনার দ্বারা যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভের দাবি করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। অবশ্য অকালমৃত্যুজনিত যাঁদের তিরোধান তাদের কথা আলাদা ; তাঁদের সাহিত্যিক সম্ভাবনার কথা পাঠকসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। 'কবিতা'য় গোড়ার দিকে যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, পরিমল রায়, জীবনানন্দ দাশ আর নেই ; হেমচন্দ্র বাগচী পীড়িত, সমর সেন স্তব্ধ। আমরা যাঁরা মধ্যতিরিশ পেরিয়ে এসেছি তাঁদের অনেকেই সংসার ও উদরান্ন-সংস্থানের সংগ্রামের ফাঁকে-ফাঁকে অতি কষ্টে ধারাবাহিকতা বজায় রাখছি। তরুণতর যাঁরা আজ লিখছেন তাঁদের মধ্যে সমর সেন বা সুভাষের প্রথম কবিতার দীপ্তি ও প্রতিশ্রুতি কোথায় ?

দীর্ঘকাল ধ'রে সম্পাদনার কাজই করছেন না, আপনি নিজেও অজস্র কবিতা যে লিখতে পারছেন এতে আমি নিজে খুব আনন্দিত। বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীও এখনো অনেক লিখছেন, কাব্যরসিক মাত্রেই এর জন্য কৃতজ্ঞ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে কয়েক বছর নীরব থাকার পর সম্প্রতি আবার উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অগ্রণী এই কবিগোষ্ঠীর কাব্যধারা পরবর্তীদের অনুপ্রেরণার উৎস হ'য়ে উঠেছে বলতে পারা যায়। প্রসঙ্গত, যে-অল্প দু-তিনটি প্রতিষ্ঠান আধুনিক বাংলা কবিতার সুদৃশ্য সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের প্রচেষ্টাও অভিনন্দনযোগ্য। কবিতাভবন ও ভারতীভবনের পরে সিগনেট প্রেস এ-কাজে অগ্রণী হয়েছেন, সম্প্রতি নাভানা ও এম. সি. সরকার।

চিঠি দীর্ঘ হ'য়ে যাচ্ছে, নিবৃত্ত হওয়া দরকার। সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে লিখছি, জানি না তথ্যের কোনো ভুল হ'লো কিনা। 'কবিতা'র পুরোনো সংখ্যাগুলো মনে রেখেই বলছি, হাল আমলে বাংলাদেশে কবির সংখ্যা যদিও বাড়ছে ভালো রচনার সংখ্যা সেই তুলনায় বাড়ছে না। তবু দুর্মর আশা, ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের দেশে আবার হয়তো কখনো কাব্যের সোনা ফলবে।

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বরবৃত্ত ছন্দ

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা'য় দীপঙ্কর দাশগুপ্ত এবং নরেশ গুহর স্বরবৃত্ত বিষয়ক আলোচনা প'ড়ে একটা কথা মনে হ'লো। আমাদের কপোলকল্পনার সাহায্যে কবিদের আমরা বড়ো বেশি সম্মানদান করছি। যা প্রাপ্য তা তো তাঁদের দিচ্ছিই, শ্রদ্ধার সঙ্গে, কৃতজ্ঞতা সঙ্গে ; কিন্তু যা তাঁরা নিজেরাও দাবি করবেন না, তা তাঁদের উপর চাপাবার জন্য অনর্থক উৎসাহ কেন ?

গোড়াতেই ব'লে নেওয়া ভালো, ছড়ার ছন্দ এবং স্বরবৃত্তের মধ্যে পার্থক্য টানার প্রয়াস, যেমন দীপঙ্কর দাশগুপ্ত করতে চেয়েছেন, আমার বিবেচনায়

সমর্থনযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যে-তারিখ থেকে তাতে লিখতে শুরু করলেন, সেদিন থেকে ছড়ার ছন্দ 'সংস্কৃত', 'পরিমার্জিত' হ'য়ে স্বরবৃত্ত রূপ পেলো : এ ধরনের স্বয়ারি দেখলে আমোদের উদ্রেক হয়। যেহেতু ছন্দ একটি কাঠামো মাত্র—তার কোনো অবয়ব নেই—পুরোনো ছন্দের কোনো পরিমার্জনা সম্ভব নয়। হয় কেউ সেই ছন্দ ব্যবহার করবেন, নয় তো নতুন কোনো ছন্দ উদ্ভাবন করবেন; এর অন্তর্বর্তী স্থান অনুপস্থিত।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত এবং নরেশ গুহ দু'জনেই ধ'রে নিয়েছেন চার মাত্রার কম বা বেশি পর্ব সংযোজিত হ'লেই স্বরবৃত্তের চরিত্র ব্যাহত হবে। কিন্তু স্বরবৃত্তের অলিখিত অনুশাসন সম্ভবত মাত্র এইটুকু যে চার মাত্রার উচ্চারণের উপযোগী সময়ের মধ্যে পর্বটিকে স্থাপন করতে হবে। চোখের বিচারে কোনো পর্ব পাঁচ, ছয়, সাত, আট, যত মাত্রাই হোক না কেন ক্ষতি নেই, পঠনকালে এমন এক বিদ্যুৎ-সংশ্লেষণ ঘটবে যে চার মাত্রার যা স্বাভাবিক উচ্চারণ-সময়, তার আয়তনের মধ্যে পর্বটি নিজের স্থান ক'রে নেবে, ঢেকে যাবে মাত্রাধিক্য-দোষ। অন্য পক্ষেও তেমনি, আপাতবিচারে যা দুই কি তিন মাত্রার পর্ব, তাকেও টেনে প'ড়ে চার মাত্রার মর্যাদা পাইয়ে দিতে হবে। যাকে আমরা স্বরবৃত্তের সুর বলি—লৌকিক ছন্দের দোলা—তার একটি প্রধান উপাদান ধ্বনির এই অহরহ সংশ্লেষণ-সম্প্রসারণ। উচ্চারণে কখনো দ্রুত তীক্ষ্ণতা, ঠিক পরক্ষণেই হয়তো বা আহ্লাদে এলিয়ে-পড়া মাত্র দু'বর্ণমণ্ডিত কোনো পর্ব। ভেবে দেখতে গেলে স্বরবৃত্তের আনন্দই হচ্ছে প্রবাহের এই উচ্চাবচতায়। প্রমাণ-স্বরূপ ছেলে-ভুলোনো ছড়া থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে; এলোমেলো যে-কয়েকটি মনে এলো নিচে তুলে দিচ্ছি :

বড়ো মরাইয়ে হাত দিয়ে
ছোটো মরাইয়ে পা দিয়ে
আয় সুয্যি ঝলমলিয়ে

এপারেতে লঙ্কা গাছটি
রাঙা টুকটুক করে

বর্ধমানের রাঙা মাটি
বুড়ি ধ'রে **কচ ক'রে কাটি**
তোমার শাশুড়ি ব'লে গিয়েছে
বেগুন কোট সে

চিহ্নিত সব ক'টি পর্বই অন্যূন পাঁচ মাত্রায়, অথচ চারমাত্রার সীমায় উচ্চারণ করতে হচ্ছে।

অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈদান্তিক' কবিতাটি আমি অবশ্য পাঁচমাত্রায় পড়েছি। (নরেশ গুহ কোথায় ঠেকে গেলেন বুঝতে পারছি না : 'প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ' তিনি যদি চার মাত্রায় পড়তে পারেন, তাহ'লে একটু ঢিল দিয়ে পাঁচ মাত্রায় পড়তে অসুবিধে কোথায়?) তবে পাঁচমাত্রিক (এমন কি ছ'মাত্রিক পর্যন্ত) অনেক কবিতাই, কোনো নিয়মপাত না-ঘটিয়েও, স্বরবৃত্তে প'ড়ে ওঠা যায়। সুতরাং নরেশবাবু যদি 'বৈদান্তিক' স্বরবৃত্তে পড়তে চান, আপত্তি তুলবো না; এক্ষেত্রে 'বেরিয়ে এলেই' পর্বটিকে চারমাত্রার বিস্তারের মধ্যে ধরতে তিনি যদি অপারগ হন, সে-ভাবনা তাঁর একার। কিন্তু ঘোরতম আপত্তি তুলতে হয় যখন দেখি এই অসামর্থ্যের প্রেরণাবশত এটা ব'লে বসেন যে 'বেরিয়ে এলেই' চারমাত্রার ছন্দের শরীরে পাঁচমাত্রিক পর্বের সচেতন মিশোলের উদাহরণ এবং, আরো, অমিয় চক্রবর্তী এই প্রয়োগের মারফৎ নতুন এক পরীক্ষার রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

উপরে বাংলার লৌকিক ছন্দ থেকে যে-ক'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় স্বরবৃত্তে পাঁচমাত্রার (কিংবা আরো বেশি) ব্যবহার অভিনব তো নয়ই, বরঞ্চ স্বরবৃত্তের অন্যতম প্রধান চরিত্রলক্ষণ। তাই নরেশ গুহ-র উক্তি ('চার আর পাঁচ মাত্রা ছন্দ এ-ভাবে মিশিয়ে অভিনব একটি বাংলা ছন্দের সূত্রপাত হয়েছে এখানে') এবং দীপঙ্কর দাশগুপ্তের মুগ্ধতাবোধ ('স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব কৌশলে ব্যবহার ক'রে তিনি [অমিয় চক্রবর্তী] যে নতুন এক ধ্বনিস্পন্দনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, এটা তাঁর বিস্ময়কর শ্রুতিবোধের পরিচয়'), দুটোই আমার কাছে সমান ভিত্তিহীন ব'লে

মনে হয়। আসলে বাংলা ভাষায় যিনিই ছন্দে কবিতা লিখেছেন, কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁকেই স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব প্রয়োগ করতে হয়েছে ; এমন কি নরেশবাবু নিজে পর্যন্ত তা করেছেন :

'আজকে আমার মন ছুটে যায় তোমায় নিয়ে ঢেউয়ের হ্রদে'

কেউ-কেউ হয়তো এ-কবিতা পাঁচমাত্রায় পড়বেন (ছ'মাত্রায় পড়া যায় না, 'তোমায় নিয়ে'-র মাত্রাহ্রস্বতার জন্য) ; আমি কিন্তু স্বরবৃত্তে প'ড়ে ঢের বেশি আরাম পাই, এবং চারমাত্রার সময়গতিকে 'ঢেউয়ের হ্রদে' উচ্চারণ করতে পারি হোঁচট না-খেয়েই।

নরেশ গুহ প্রশ্ন তুলেছেন

'দু'চার পিপে **জমিয়ে নস্য** হঠাৎ ভোরে **হলো অদৃশ্য**'

স্বরবৃত্তের নিয়ম মেনে কী ক'রে পড়া যতে পারে। আমি বলবো 'দু'চার পিপে এবং 'হঠাৎ ভোরে' পড়তে যতটা সময় ব্যয়িত হচ্ছে, 'জমিয়ে নস্য' এবং 'হলো অদৃশ্য'-র জন্য তার বেশি সময় দেওয়া যাবে না ; দিতে গেলে স্বরবৃত্তের মজাই নষ্ট। ঐ একই কবিতায় একটু বাদে

রান্না রেঁধে কান্না কেঁদে **সকলের প্রাণ** প্রাণে বেঁধে
দিদিঠাকরুন গেলেন চ'লে

'রান্না রেঁধে' যে-সময়ের আয়তনে প'ড়ে নিতে হচ্ছে, ঠিক ততটুকু সময়েই 'সকলের প্রাণ' এবং 'দিদিঠাকরুন'ও উচ্চারণ করতে হবে। মানবো না এখানে ছন্দ নিয়ে কোনো নতুন পরীক্ষা আছে।

ব্যাঙ্কক, থাইল্যাণ্ড — **অশোক মিত্র**

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শ্রী অশোক মিত্রের পত্রটিতে অনেক ভাববার কথা আছে, কিন্তু তিনি স্বরবৃত্তের প্রকৃতির যে-বর্ণনা দিয়াছেন তা মেনে নেয়া অসম্ভব। চার মাত্রার উপযোগী সময়ের মধ্যে তিন মাত্রা পড়া যেতে পারে, হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচ না হোক সাড়ে-চার, কিন্তু দুই বা ছয় কদাচ নয়—সাত, আট প্রভৃতির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। পড়া যায় না, তার কারণ প্রাকৃত জগতের পশু-তথ্যগুলির অজেয় গোঁয়ার্তুমি ; চার জনের জায়গায় পাঁচজন চেপে-চুপে বসতে পারে, বা তিনজনের পক্ষেও ছড়িয়ে ব'সে আসনটা ভরিয়ে দেয়া সম্ভব, কিন্তু মাত্র দু-জন হ'লে অপূরণীয় ফাঁক থেকে যায়, আর ছ-জন হ'লে অন্য আসনের ব্যবস্থা না-ক'রে উপায় থাকে না। স্থানের সঙ্গে আমাদের দেহের যা সম্বন্ধ, সময়ের সঙ্গে স্বরেরও তা-ই ; তফাৎ এই যে সময় আরো ক্ষমাহীন ; যেমন সে অধিক ভার বইতে রাজি হয় না, তেমনি শূন্যতাও তার পক্ষে অসহ্য। অত্যন্ত বেশি, আর অত্যন্ত কম, এ দুটোই সেখানে অচিন্তনীয় ; আমাদের জিহ্বার ও শ্বাসযন্ত্রের এমন কোনো কসরৎ নেই যার সাহায্যে, স্বরবৃত্তের বিধান স্বীকার ক'রে নিয়ে, চার মাত্রার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে দুই বা ছয় মাত্রা উচ্চারণ করা সম্ভব।

পুরোনো ছন্দের পরিমার্জনা বিষয়ে পত্রলেখক যা বলেছেন, তারও প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। এই পরিমার্জনা ও পরিবর্তন—শুধু যে সম্ভব তা নয়, যুগে-যুগে কবিদের নিত্যকর্ম। এ-কথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে কোনো-এক সময় (ধরা যাক 'ক্ষণিকা'র সময়) থেকে বাংলার লৌকিক ছড়ার ছন্দ রবীন্দ্রনাথের হাতে সুসংস্কৃত হ'য়ে স্বরবৃত্তে পরিণত হ'লো ; তাঁর নির্দিষ্ট চার মাত্রার পর্বকে—মুখে আমরা যে যা-ই বলি—পরবর্তী কোনো কবি কাজের বেলায় উল্লেখ্যভাবে লঙ্ঘন করতে পারেননি। (প্রসঙ্গত, নরেশ গুহ-র 'আজকে আমার মন ছুটে যায় তোমায় নিয়ে ঢেউয়ের হ্রদে' পংক্তির প্রত্যেক পর্বে ঠিক-ঠিক চার মাত্রাই আছে—শুধু ফাঁকগুলো ভরিয়ে দেয়া হয়েছে ব'লে পত্রলেখকের ধরতে ভুল হ'লো।) এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন ও আরো কেউ-কেউ অনেক আলোচনা করেছেন ; এ নিয়ে আজকের দিনে তর্কের কোনো অবকাশ নেই।

গ্রাম্য ছড়ার বন্ধুরতা আমাদের কানে যে এখনো ভালো লাগে তার কারণ ছেলেবেলার স্মৃতি, লুপ্ত জিনিশের প্রতি সেন্টিমেন্টাল মমত্ববোধ, এবং, হয়তো, স্বাদ-বদলের ক্ষণিক উত্তেজনা। উপরন্তু, পত্রে উদ্ধৃত উদাহরণগুলোর মধ্যে 'রাঙা টুকটুক'-এ বস্তুত চার মাত্রার বেশি নেই, 'বড়ো মরাইয়ে' 'ছোটো মরাইয়ে'—'ইয়ে' যুগ্মস্বর ব'লে—বড়ো জোর সাড়ে-চার পাওয়া যায়, এবং 'কচ ক'রে কাটি' আর 'তোমার শাশুড়ি'—মানতেই হয়—আধুনিক কানে অসহনীয়, এবং আধুনিক কবিতায় কল্পনাতীত। অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈদান্তিক' কবিতায় যেহেতু ভিন্ন-ভিন্ন পর্বে তিন, চার ও পাঁচ মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে—এবং কবিতাটি মোটের উপর নিশ্চয়ই সুখশ্রাব্য হয়েছে—তাই একে মিশ্র ছন্দের উদাহরণ ব'লে না-মানলে অন্য নানারকম ভ্রান্তির ভয় থেকে যায়। (ছন্দের দিক থেকে এর খুব কাছাকাছি 'আনমনা গো আনমনা', কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাটি, শেষ পর্যন্ত, অনেক বেশি নিয়মিত।)

'হয় কেউ সেই ছন্দ ব্যবহার করবেন, নয় নতুন কোনো ছন্দ উদ্ভাবন করবেন; এর অন্তর্বর্তী স্থান অনুপস্থিত'—এ-কথার উত্তরে আমাকে আরো একটু লিখতে হ'লো। যতদূর দেখা গেছে, পুরোনো পদকর্তা ও মাইকেলের পরে, ছন্দ-বিষয়ক সবগুলো **আবিষ্কার** রবীন্দ্রনাথ ক'রে গেছেন; এর পরে আর কোনো আবিষ্কার সম্ভব নয়, তাই **নতুন** ছন্দও সম্ভব নয়। কিন্তু তবু উদ্ভাবনার অবকাশ ফুরিয়ে যায়নি, বহু কর্তব্য র'য়ে গেছে সেদিকে—চিরকালই থাকবে—তারই নাম পুরোনো ছন্দের পরিবর্তন ও পরিশোধন, যার দ্বারা প্রত্যেক কবি তাঁর মৌলিক প্রতিভার চিহ্ন রাখতে পারেন। উদাহরণত, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মাইকেলের পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে, এবং রবীন্দ্রনাথের পরে সমকালীন কবিদের হাতে, বাংলা পয়ারের এমন সব পরিবর্তন ঘটেছে যাকে জন্মান্তর বলা যায়, অথচ তার মূলসূত্র এখনো এক ও অবিকৃত। ক্ষুদ্র কবিরা 'নতুন ছন্দ' বানিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, ভালো কবিদের লক্ষ্য থাকে পুরোনোকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করার দিকে। —বু. ব.

সাতটি এপিগ্রাম

বিষ্ণু দে

কবিতা-সর্কার বা সরকার

সে শুধু চাটিই চেনে, ধাঁই ধপাধপ পদপাতে
কবিতার নাড়ি ছেড়ে, যতো ছেড়ে সেও ততো মাতে,
স্নায়ুতে চাটির স্মৃতি, আবাল্য সে টিকটিক্-বরদার
ছন্দ মিল গুনে মরে, জাবেদায় কবিতা-সর্কার॥

বামেতর

বামেই হেলেন দেবী দাক্ষিণ্যের প্রসাদে সর্বদা,
বামে তাঁর পক্ষপাত, জীবধাত্রী বাগ্‌দেবী বরদা
ত্রিনয়নী ভ্রূকুটিতে মারেন সরোষে বামেতরে,
অবশ্য বোঝে না মূর্খ বামেতর কখন যে মরে॥

এলার্জি

অবাক সবাই ভাবি কী অধ্যবসায়,
বাক্‌দেবীকে ক'রে দিলে মুমূর্ষু মশায়!
কীর্তিনাশা লেখা ছাপে কীর্তির আর্জিতে,
জানে না বাক্‌দেবী দুস্থ তারই এলার্জিতে॥

অমুকবাবু

কলকাতায় সুখ নেই, ঘরে পথে ভিড়;
অর্থাভাব চিরস্থায়ী; আড্ডাতেও চিড়,
নিত্যসঙ্গী টাইফএড, বসন্ত, কলেরা:
এবং অমুকবাবু, দুর্ভোগের সেরা॥

* সরকার সরকার চার অক্ষর ব'লে ছন্দ ভুল, সুতরাং সর্কার লেখাই নিরাপদ।

সংস্কৃতি

কোথা পুত্তলিকা? ভোজবাজিতে কঙ্কাল
দিকে দিকে সংস্কৃতির সাজে দ্বারপাল।
শিল্পী সাহিত্যিক সব পাপোষে বাহিরে,
সরস্বতী কেঁদে যান ত্রাহি রে ত্রাহি রে॥

পাঁচ সিকে

সিদ্ধান্ত যেই না হল, বিরাট দপ্তর
খোলা হল, দপ্তরিও ষাট কি সত্তর,
লক্ষ লক্ষ টাকা গেল, এদিকে ওদিকে,
অধিকর্তা ডিম দেন কুল্লে পাঁচ সিকে॥

পেনসন

এ চাকুরি ও চাকুরি তবু কর্তা কন,
মাহিনার পরিবর্তে চাই না পেনসন।
শুনেছি বেকার সবে পরলোকে স্বর্গে,
কর্তার নরকে লোভ, কমপক্ষে মর্গে॥

KAVITA

(Poetry)

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1, 50
Rupee one per copy.

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE
Assistant Editor : NARESH GUHA

Printed at Swapna Press Ltd., 8/1, Lallbazar Street, Calcutta 1

লক্ষ্মী ঘিঁয়ে
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেমজী · কলিকাতা ॥